আদি-লীলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত—সেই বড় ধন্য ॥ ১

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয়তত্ত্বের কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, শুন পাঁচের বিচার ॥ ২

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যসঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যং নত্বা প্রণম্য অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতনস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা নির্ব্বিচার-প্রেমভক্তিদানশীলতা লিখ্যতে বর্ণ্যতে ময়া ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং শ্রীচৈতন্যম্? অগতীনাং অকিঞ্চনানাং একঃ গতিঃ শরণং য এব তম্। পুনঃ কীদৃশম্? হীনায় পতিতায় জনায় অর্থাধিকং প্রেমাণং সাধ্যতে যেন তম্। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। অগত্যেকগতিং (গতিহীনের একমাত্র গতিস্বরূপ) হীনার্থাধিকসাধকং (নীচজনেও পরমপুরুষার্থ-প্রেম-প্রদাতা) শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যকে) নত্বা (নমস্কার করিয়া) অস্য (ইঁহার—শ্রীচৈতন্যের) প্রেমভক্তিবদান্যতা (প্রেমভক্তি-বিষয়ে বদান্যতা) লিখ্যতে (বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ। যিনি গতিহীনের একমাত্র গতি এবং যিনি নীচ পতিত জনসমূহকেও পরমপুরুষার্থ-প্রেম প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া প্রেমভক্তি-বিষয়ে তাঁহার বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।১।

দাতা-শিরোমণি শ্রীমন্ মহাপ্রভু পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অদ্ভুত বদান্যতা।

২। **পূর্ব্বে**—প্রথম পরিচ্ছেদে "বন্দে গুরূন্"-ইত্যাদি শ্লোকে। **ছয় তত্ত্ব**—গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয় তত্ত্ব। এই ছয় তত্ত্বের মধ্যে ১।১।২৬-২৯ পয়ারে **গুরু তত্ত্ব** বর্ণনা করা হইয়াছে; তদ্ব্যতীত অন্য **পাঁচের**—ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই পাঁচটী তত্ত্বের বিচার এই পরিচ্ছেদে করা হইতেছে, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে।

৩। **শ্রীচৈতন্য সঙ্গে**—শ্রীচৈতন্য-সহিতে; শ্রীচৈতন্যকেও এক তত্ত্ব মনে করিয়া। **পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যকে লইয়া পাঁচটী তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্য এক তত্ত্ব, তদ্ভিন্ন আরও চারিটী তত্ত্ব, এই মোট পাঁচ তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন, নবদ্বীপে। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে (শ্রীচৈতন্য ব্যতীত অপর) পাঁচটী তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা এ স্থানের অভিপ্রেত অর্থ হইতে পারে না; কারণ, ঐরূপ অর্থ করিলে "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটে (১।১।১৪ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য); উক্ত শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ব্যতীত, চারিটী তত্ত্বের মাত্র উল্লেখ আছে—পাঁচটী তত্ত্বের উল্লেখ নাই। তাই গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকাও বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যকে একতত্ত্ব ধরিয়াই পাঁচ তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যকে একতত্ত্ব না ধরিলে মোট চারিটী মাত্র তত্ত্ব হয়। "স্বাভিন্নত্বেন যুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্ব-মিহোচ্যতে। অন্যথা তদসম্বন্ধাত্তত্ত্বং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্।৭॥"

সঙ্কীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—বহু লোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিলে,

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। | রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই গানকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। শ্রীভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভঃ॥" পাঁচ তত্ত্ব অবতীর্ণ হইলেন কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। **পঞ্চতত্ত্ব মিলি** ইত্যাদি—পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ করেন। একাকী সঙ্কীর্ত্তন হয় না; সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইলে বহু লোকের দরকার; তাই সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-রস আস্বাদনের অভিপ্রায়ে পাঁচ তত্ত্ব পাঁচ পৃথকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পাঁচ তত্ত্বের পরিচয় ১।১।১৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪। উক্ত পাঁচটী তত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন। পাঁচটী বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই; স্বরূপতঃ একই তত্ত্ব-বস্তু ভাবাবেশাদি-ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকট করিয়াছেন; "উপাধিভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহ প্রদর্শ্যতে॥ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৭॥" **রস আস্বাদিতে** ইত্যাদি—রসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন ভাবাবেশের প্রয়োজন; তাই রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্ত একই তত্ত্ববস্তু পঞ্চরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। একই তত্ত্ব কেন পাঁচ রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাই বলা হইল। **তভু**—একই তত্ত্ববস্তু হইলেও। **রস** আস্বাদিতে—এস্থলে পূর্ব্ব পয়ারানুসারে রস বলিতে সঙ্কীর্ত্তন-রসই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একই নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিভিন্ন ভাবের ভক্ত বিভিন্ন রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; নাম কল্পতরু সদৃশ—নাম ভক্তের ভাব-অনুরায়ী রসই ভক্তকে দান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভিন্ন ভাবের ভক্তের নিকটে বিভিন্ন রসের স্ফুরণ করেন, তদভিন্ন শ্রীনামও তেমনি বিভিন্ন ভক্তের প্রাণে বিভিন্ন রসের স্ফুরণ করিতে পারেন,—আবার একই ভাবের ভক্তের নিকটেও ভাবের বৈচিত্রী অনুসারে একই রসের অশেষ বৈচিত্রী উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ-কারণ নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার। সঙ্কীর্ত্তন করার জন্যও বহু লোকের প্রয়োজন, তজ্জন্য একই তত্ত্বের বহু (পাঁচ) রূপে প্রকটনের প্রয়োজন—ইহাই পঞ্চ-তত্ত্বের একটী প্রয়োজনীয়তা। প্রচারের আনুকূল্যার্থ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ সঙ্কীর্ত্তন-রসের বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্তও সঙ্কীর্ত্তনকারিদের ভাবাবেশের বৈচিত্রী প্রয়োজন; এই ভাবাবেশের বৈচিত্রীর সম্পাদনের নিমিত্তও একই তত্ত্বের বহু রূপে প্রকটন আবশ্যক—ইহা পঞ্চ-তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা। অবতারের বহিরঙ্গ কারণের দিক্ দিয়াই উক্ত দুইটী প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আবার অন্তরঙ্গ কারণের দিক্ দিয়াও পঞ্চতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কান্তাভাবের আশ্রয়রূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন—ইহাই অবতারের অন্তরঙ্গ হেতু। আশ্রয়রূপে কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে ব্রজে স্বয়ং শ্রীরাধা সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি হইয়াও বহু-গোপসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহারই ন্যায় আশ্রয়রূপে সে সমস্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও বিভিন্ন ভাবাবেশযুক্ত লীলানুকূল বহু পার্ষদের প্রয়োজন; পঞ্চতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছেন; অন্তরঙ্গ ভাবে—ব্রজের ভাবাবেশে—এই পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়াই আশ্রয়-জাতীয় কান্তারস-বৈচিত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন—ইহাই অবতারের অন্তরঙ্গ কারণের দিক্ দিয়া পঞ্চতত্ত্ব-প্রকটনের প্রয়োজনীয়তা বলিয়া মনে হয়।

এস্থলে আর একটী বিষয় প্রনিধানের যোগ্য। ১।১।১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ—এই ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, অপর পাঁচ তত্ত্বের বর্ণনাও করিয়াছেন বটে; কিন্তু অপর পাঁচ তত্ত্বের স্বরূপের বিশেষ বিচার প্রথম পরিচ্ছেদে করেন নাই—এই পরিচ্ছেদে তাহা করিতেছেন। এই পাঁচ তত্ত্বের স্বরূপের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা স্বরূপতঃ একই তত্ত্ববস্তু, শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন; গুরুতত্ত্বকে ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত না করার হেতু এই যে, গুরু স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত (১।১।২৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপেই আত্মপ্রকট করিয়াছেন, গুরুরূপে আত্মপ্রকট করেন নাই; পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় গুরু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন নাই। গুরুদেব যখন কোনও শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখন তাঁহার

তথাহি শ্রী(স্ব)রূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ ২

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥ ৫
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর।
আর যত দেখ সব—তাঁর পরিকর॥ ৬
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥ ৭
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥ ৮
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব—।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥ ৯
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন—গুরুকে দীক্ষাদানের শক্তিদান করেন; তাঁহার প্রিয়তম-ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে দীক্ষাদান-কালে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন; এবং গুরুদেবও সেই শক্তির প্রভাবেই দীক্ষাদান-সামর্থ্য লাভ করেন বলিয়া সেই শক্তিকেই মূলতঃ গুরু বলা যায়; তাই ১।১।১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপেও বিলাস করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি গুরুর চিত্তে শক্তিরূপে বিলাস করেন, গুরুর দেহ ধারণ করিয়া বিলাস করেন না।

শ্লো। ২। অন্বয়াদি ১।১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকোক্ত পঞ্চতত্ত্ব এই:—(১) ভক্তরূপ, (২) ভক্তস্বরূপ (৩) ভক্তাবতার, (৪) ভক্তাখ্য এবং (৫) ভক্ত-শক্তিক। শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

৫-১০। এই কয় পয়ারে ভক্তরূপ তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। রসিক-শেখর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্বরূপতঃ ভক্ত না হইয়াও ভক্তের ভাব বা রূপ ধারণ করিয়াছেন—বলিয়া তাঁহাকে "ভক্তরূপ" তত্ত্ব বলে।

স্বয়ং ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অন্য কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখে না; তিনি অনন্য-সিদ্ধ, অনন্যাপেক্ষ। **একলে ঈশ্বর**—একমাত্র তিনিই অন্যনিরপেক্ষ ঈশ্বর, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ঈশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। **অদ্বিতীয়**—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; **নন্দাত্মজ**—নন্দ-নন্দন; ইহা দ্বারা তাঁহার নরলীলত্ব সূচিত হইতেছে। **রসিক-শেখর**—শ্রুতিতে উক্ত "রসো বৈ সঃ;" রসাস্বাদন-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পটু। **রাসাদি বিলাসী** ইত্যাদি—ইহা দ্বারা তাঁহার রসিক-শেখরত্ব পরিস্ফুট হইতেছে এবং মধুর-ভাবাত্মিকা লীলাতেই যে তাঁহার রসিক-শেখরত্বের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব স্ফুরিত হয়, তাহারই ইঙ্গিত করা হইতেছে। **সেই কৃষ্ণ** ইত্যাদি—যিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ শূন্য, অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্, যিনি নরলীল, যিনি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি এবং ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত মধুর-ভাবাত্মিকা রাসাদি-লীলাতেই যাঁহার সমধিক আনন্দ—সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিকরবর্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **শুদ্ধ কলেবর**—ঈশ্বরত্ব-ভাবময় কলেবর। **একলে ঈশ্বর** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই একমাত্র অন্যনিরপেক্ষ ঈশ্বর; তাঁহার দেহও শুদ্ধ-ঈশ্বরত্বময়; তথাপি তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বময় দেহই ভক্তভাবময় হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকাতে যাবতীয় ভক্তভাবের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান থাকাতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করাতেই তাঁহাকে ভক্তভাবময় বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্; তাঁহার আবার কিসের অভাব যে, তাঁহাকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইল? উত্তর:—কোনও অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তাঁহার মাধুর্য্যের এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; কারণ, **কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের** ইত্যাদি

ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই ॥১১
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥১২
এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি ॥১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—কৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই এক অদ্ভুত ধর্ম্ম যে, ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়েন; কিন্তু ভক্তভাব ব্যতীত তাহার আস্বাদন সম্ভব হয় না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; তাঁহারই স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা, শ্রীরাধার ভক্তভাবও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং সেই ভক্তভাবের অঙ্গীকারে তাঁহার অন্যনিরপেক্ষতারও হানি হইল না।

ভক্ত-স্বরূপ ইত্যাদি—এই পয়ারার্দ্ধে ভক্তস্বরূপ-তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন; শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাই বলিয়া যাঁহার অভিমান, তিনিই ভক্ত-স্বরূপ-তত্ত্ব; শ্রীবলরামে মূলভক্ত-অভিমান (১।৬।৭৫) বলিয়া তিনিই মূল ভক্ত-স্বরূপ—স্বরূপে ভক্ত, বা মূল ভক্ততত্ত্ব এবং তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ভক্তস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তস্বরূপ।

১১। ভক্তাবতারের পরিচয় দিতেছেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবতার; মূল ভক্ত-তত্ত্ব শ্রীবলরামের অংশ-কলারূপ অবতার বলিয়া তাঁহাকে ভক্তাবতার বলা হয়। ভক্তাবতার-শব্দের তাৎপর্য্য ১।৬।৮৪ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **এই তিন তত্ত্ব**—ভক্তরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্ত-স্বরূপ তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ এবং ভক্তাবতার-তত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—এই তিনতত্ত্ব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেও প্রভু, বা স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব; ইহাই এই তিন তত্ত্বের বিশেষত্ব। **গাই**—গান করি; কীর্ত্তিত হয়।

১২। এই তিন প্রভুর মধ্যে একজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতেছেন মহাপ্রভু; কারণ, তিনি অদ্বিতীয় ও অন্যনিরপেক্ষ পরমেশ্বর ভগবান্; আর দুইজন অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন প্রভু, ইঁহারা মহাপ্রভু নহেন; কারণ, ইঁহারা ঈশ্বর বটেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ন্যায় অদ্বিতীয় অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং ভগবান্ নহেন; ইঁহাদের প্রভুত্ব বা ঈশ্বরত্ব—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভুতার উপর নির্ভর করে। তাই এই দুইজন প্রভু হইলেও তাঁহাদের মূল বা অংশী মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণ-সেবা করিয়া থাকেন; অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

১৩। এই তিন জন প্রভুতত্ত্ব বলিয়া সকলেরই আরাধ্য, সকলেই তাঁহাদের আরাধনা করিয়া থাকেন। আর চতুর্থ তত্ত্ব যে ভক্ততত্ত্ব—তাহা আরাধক-তত্ত্ব মাত্র; ভক্ততত্ত্বও উক্ত তিনতত্ত্বেরই আরাধনা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বারাধ্য—ইহাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরাধনার কথা নিষেধ করা হইল না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তুল্যভাবে ভজনীয়; অন্যথা ভজনের ও লীলারসাস্বাদনের পূর্ণতা লাভ হয় না; এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য; ভূমিকায় নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধেও সূত্রাকারে হেতুর উল্লেখ আছে।

চতুর্থ ইত্যাদি—তিন প্রভুকে সর্ব্বারাধ্যতত্ত্বরূপে অন্য দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার, পরবর্ত্তী ১৪।১৫ পয়ারদ্বয়ে ভক্তাখ্যতত্ত্ব শ্রীবাসাদিকে "শুদ্ধ-ভক্ততত্ত্ব" এবং ভক্ত-শক্তিক-তত্ত্ব শ্রীগদাধরাদিকে "অন্তরঙ্গ ভক্ত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অর্থাৎ এই উভয় তত্ত্বকেই ভক্ত বলায় প্রথমোক্ত সর্ব্বারাধ্য তিনটী তত্ত্বের আরাধকই বলা হইল। ইহা হইতে মনে হয়, আলোচ্য পয়ারে "ভক্ত-তত্ত্ব"-শব্দে ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক এই উভয় তত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই উভয়কেই একত্রে "চতুর্থ তত্ত্ব বা ভক্ত-তত্ত্ব" বলা হইয়াছে।

ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক, এই দুই তত্ত্বও একই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ—সুতরাং স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন; ইঁহাদের মধ্যে ভক্তভাবই প্রধানরূপে প্রকটিত; তাই ইঁহাদিগকে

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন ॥ ১৪
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার ॥ ১৫
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥ ১৬
যাঁহা-সভা লৈয়া করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁহা-সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন ॥ ১৭
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ১৮
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যতযত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ১৯
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেবল ভক্ত-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; ইঁহারা তিন প্রভুতত্ত্বের আরাধক; ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে কাহারও আরাধ্য নহেন, অবশ্য পরিকররূপে মহাপ্রভুর অনুগত সাধকমাত্রেরই আরাধ্য।

১৪। এই পয়ারে ভক্তাখ্য-তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি অসংখ্য ভক্তই ভক্তাখ্যতত্ত্ব। ভক্তির কৃপা ইঁহাদের মধ্যে প্রকটিত বলিয়া ইঁহারা ভক্ত-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাই ইঁহাদিগকে ভক্তাখ্য বলে।

১৫। এই পয়ারে ভক্তশক্তিক-তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীগদাধরাদি প্রভুর শক্তির অবতার; ইঁহারাই ভক্তভাবাপন্ন বলিয়া ভক্তশক্তিক-তত্ত্ব। ১।১।২৭ পয়ারের টীকায় শ্রীগদাধরের শক্তিত্ব-বিচার দ্রষ্টব্য। **অন্তরঙ্গ-ভক্ত**—প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ ভক্ত; ইঁহারা প্রভুর মনের কথা সমস্ত জানেন।

১৬-১৭। পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ কি কি কাজ করিয়াছেন, সূত্ররূপে তাহার বর্ণনা দিতেছেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত কার্য্যের অনুরোধেই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রকটন।

নিত্যবিহার—নিত্যলীলা; ইঁহারা প্রভুর নিত্যলীলার নিত্য-পার্ষদ। **কীর্ত্তন-প্রচার**—এই সমস্ত নিত্য-পার্ষদদিগকে লইয়াই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকট-লীলায় প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন।

প্রেম-আস্বাদন-ইত্যাদি—এই সমস্ত নিত্য-পার্ষদদের সাহচর্য্যেই প্রভু (অপ্রকট-লীলায় এবং) প্রকট-লীলায় নিজে প্রেম আস্বাদন করেন এবং প্রেমাস্বাদনের আনুষঙ্গিকভাবে প্রকট-লীলায় জীবদিগকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন।

১৮-২০। **পৃথিবী আসিয়া**—জগতে অবতীর্ণ হইয়া। **পূর্ব্ব-প্রেম-ভাণ্ডারের**—পূর্ব্ব (অর্থাৎ ব্রজ) লীলার যে প্রেম, তাহার ভাণ্ডারের। **মুদ্রা**—শিল মোহর। টাকা-পয়সা বা কোনও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি কোনও থলিয়ায় রাখিয়া তাহার মুখ রশি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধের উপরে গালা গলাইয়া তাহাতে নামাঙ্কিত পিতলের মোহর চাপিয়া দেওয়া হয়; ইহার ফলে বাঁধের উপরে নামাঙ্কিত মোহরের চিহ্ন থাকিয়া যায়; এইরূপ নামাঙ্কিত চিহ্নকেই মুদ্রা বলে; থলিয়া খুলিতে গেলেই এই মুদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং কেহ থলিয়া খুলিয়াছে কিনা, তাহা মুদ্রা দেখিয়াই ধরিতে পারা যায়। এইরূপ মুদ্রা-চিহ্ন দেওয়ার সার্থকতা এই যে, মুদ্রা নষ্ট হইলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মালিক ব্যতীত অপর কেহ থলিয়া খুলিতে চেষ্টা করেনা এবং যাহাতে ঐরূপ মুদ্রা অঙ্কিত থাকে, তাহা মালিক ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে যে খোলা নিষিদ্ধ, তাহাই সূচিত হয়। যে ভাণ্ডারে বা কোঠায় বা বাক্স আদিতে মুল্যবান্ জিনিস পত্র থাকে, তাহার দরজার কপাটে তালা লাগাইয়া তালার উপরেও কেহ কেহ মুদ্রা চিহ্নিত করিয়া রাখেন; তালা খুলিতে গেলেই মুদ্রা নষ্ট হইয়া যায়। **উঘাড়িয়া**—ভাঙ্গিয়া; খুলিয়া। "মুদ্রা উঘাড়িয়া"-বাক্যের সার্থকতা এই যে, যে ভাণ্ডারে ব্রজপ্রেম সঞ্চিত ছিল, সেই ভাণ্ডারের চাবি যেন পূর্ব্বে (ব্রজলীলায়) এই পঞ্চতত্ত্বের কাহারও নিকটেই ছিল না; সুতরাং ভাণ্ডারস্থ দ্রব্যের আস্বাদন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই, তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত লোভও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এক্ষণে—নবদ্বীপলীলায় ঐ ভাণ্ডারের চাবি তাঁহারা পাইয়াছেন, পাইয়াই প্রবর্দ্ধিত লোভের বশে ভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহারা—সুস্নিগ্ধ জল প্রাপ্তিতে মহাপিপাসার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিতে থাকে, সেইরূপ ব্যগ্রতার সহিত তাঁহারা ব্রজ-প্রেমের ভাণ্ডার লুটিতে আরম্ভ

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। | যেই যাহাঁ পায় তাহাঁ করে প্রেমদান ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলেন, লুটিয়া লুটিয়া সেই প্রেমসুধা পান করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের বিষয়মাত্র ছিলেন বলিয়া আশ্রয়-জাতীয় সুখের (আশ্রয়রূপে প্রেমের) আস্বাদন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল (প্রেমের আশ্রয়জাতীয় আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যেন মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডারে আবদ্ধ ছিল); কিন্তু শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন—শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ হেতু—আশ্রয়জাতীয় সুখের আস্বাদনে তাঁহার যোগ্যতা জন্মিল [মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডারের (রাধাভাবরূপ) চাবি পাইলেন, তাই সেই ভাণ্ডার খুলিয়া ফেলিলেন] এবং যথেচ্ছভাবে সেই সুখ আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

পাঁচে মিলি—পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-ভাবই হইল আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমভাণ্ডারের চাবি; সুতরাং পঞ্চতত্ত্বের অপর চারিতত্ত্বে আশ্রয়-জাতীয় ভাব থাকিলেও সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা ছিল একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গে। ব্রজলীলায় সখীমঞ্জরীগণ যেমন শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেমাস্বাদনে রসপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমাস্বাদনেও অপর চারিতত্ত্ব রসপুষ্টির সহায়তা করিয়াছেন এবং রসপুষ্টির সহায়তার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ—ব্রজলীলার সখীমঞ্জরী-আদির ন্যায় তাঁহারাও যথেচ্ছরূপে সেই প্রেম-রসাস্বাদনে কৃতার্থ হইয়াছেন। **যত যত পিয়ে** ইত্যাদি—সাধারণতঃ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জলপান করিতে থাকিলে জলপানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিপাসা ক্রমশঃ কমিতে থাকে; সুতরাং জলপানের আগ্রহও ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কিন্তু ব্রজপ্রেমের এক অদ্ভুত মহিমা এই যে, পিপাসার্ত্ত হইয়া ইহা যতই পান করা যায়, ততই পানের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীলা উৎকণ্ঠার ফলে পানের নিমিত্ত যেন একটা মত্ততা জন্মিতে থাকে। তাই, **পুনঃ পুনঃ** ইত্যাদি—বার বার ঐ প্রেমরস পান করিতে করিতে বর্দ্ধনশীলা উৎকণ্ঠাবশতঃ—বিশেষতঃ প্রেমরসের স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্মবশতঃ—পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে যেন একটা মহা মত্ততা জন্মিয়া গেল; এই প্রেমমত্ততার ফলে তাঁহারা কখনও বা হাসিতে থাকেন, কখনও বা কাঁদিতে থাকেন, আবার কখনও বা নামরূপলীলাদি-বিষয়ক গান গাহিতে থাকেন—উন্মত্ত লোক যেরূপ করিয়া থাকে, তাঁহাদের আচরণও যেন ঠিক তদ্রূপ হইয়া গেল। "হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। শ্রীভা ১১।২।৪০ ॥"

২১। কেবল যে তাঁহারা নিজেরাই প্রেমসুধা পান করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই—পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান বিচার না করিয়া—যখন তখন, যেথানে সেখানে, যাকে তাকে, উক্ত প্রেমসুধা দান করিয়াছেন। যাহাকেই সাক্ষাতে পাইয়াছেন, তাহাকেই প্রেমদান করিয়াছেন।

পাত্রাপাত্র-বিচার—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাত্মা প্রভৃতি কোনওরূপ বিচার (না করিয়াই প্রেমদান করা হইয়াছে)। অপরাধীকে কিরূপে প্রেমদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় বিচার ১।৮।২৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **নাহি স্থানাস্থান**—দেবমন্দিরাদি কি গঙ্গাতীরাদি পবিত্র স্থানের অপেক্ষা না করিয়া—হাটে, মাঠে, ঘাটে,—যেথানে যাহাকে পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। **প্রেমদান**—প্রেমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে যোগ্যতাবিচারের মাপকাটি জাতিকুল, বিদ্যা, ধনসম্পত্তি আদি নহে; চিত্তের অবস্থাবিশেষই ইহার মাপকাটি। যে পর্য্যন্ত চিত্তে অপরাধাদিজনিত বা দুর্ব্বাসনাদিজনিত কলুষ থাকে, যে পর্য্যন্ত ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রেম পাওয়া যায় না। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা দূর হইলেই ভগবৎ-কৃপায় প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। প্রেম "শ্রবণাদিশুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥২।২২।৫৭॥"; ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকালে কেবল যে এই সাধারণ বিধি অনুসারেই প্রভু প্রেমদান করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রভু যে প্রেমের ও করুণার বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যে কেহ প্রভুর মুখে হরিনাম শুনিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অথবা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার চিত্তের

লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার,—প্রেম শতগুণ বাড়ে।২২
উথলিল প্রেমবন্যা,—চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সভারে ডুবায়॥ ২৩
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥ ২৪
জগত ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাবতীয় কলুষ দূরীভূত হইয়াছে, তন্মুহূর্ত্তেই তিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। প্রেমদানব্যাপারে প্রভু এবং তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ তাঁহার পার্ষদবর্গও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন নাই। আপামরসাধারণকেই তাঁহারা সুদুর্লভ ব্রজপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাই গৌরলীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ১।৭।৩৫ এবং ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২। **লুটিয়া**—ব্রজপ্রেমের ভাণ্ডার লুট করিয়া; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **খাইয়া**—প্রেমসুধার ভাণ্ডার লুট করিয়া নিজেরা তাহা যথেষ্টভাবে পান করিলেন। **দিয়া**—নিজেরা পান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু, যাহাকে-তাহাকে তাহা দানও করিলেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহারা প্রেমসুধার **ভাণ্ডার উজারে**—ভাণ্ডার যেন শূন্য করিয়া ফেলিলেন; সাধারণ ভাণ্ডারের ন্যায় হইলে, এইরূপ যথেচ্ছ দানে ও পানে প্রেমসুধার ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়াই যাইত; কিন্তু এই প্রেমভাণ্ডারটী এক অতি **আশ্চর্য্য ভাণ্ডার**—অচিন্ত্য অদ্ভুত মহিমাসম্পন্ন ভাণ্ডার ছিল; তাই এই ভাণ্ডার হইতে যতই জিনিস ব্যয় করা যাইত, ততই যেন ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিত, (ইহা প্রেমের পূর্ণতারই পরিচায়ক। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ শ্রুতিঃ), বরং এক গুণ খরচ করিলে প্রেম শতগুণ বাড়িয়া যাইত। তাই যথেচ্ছ দানে এবং পানেও ভাণ্ডার অটুট থাকিয়া গেল; কেবল তাহাই নহে, ভাণ্ডারের প্রেম-পরিমাণ এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতে প্রেমের বন্যা উথলিয়া উঠিল।

২৩-২৪। প্রেমবন্যা উথলিয়া উঠিয়া **চৌদিকে বেড়ায়**—চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বদিকে ধাবিত হইল; তাহার ফলে স্ত্রীলোক, পুরুষ—বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সকলেই সেই প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গেল—**সজ্জন দুর্জ্জন**—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সাধু-অসাধু, পাপী, পুণ্যাত্মা—সুস্থ-অসুস্থ, পূর্ণাঙ্গ লোক, কিম্বা কোনও অসৎ কর্ম্মের ফলে যাহারা **পঙ্গু**—বিকলাঙ্গ (খোঁড়া প্রভৃতি) হইয়া গিয়াছে বা **জড়**—একেবারে চলাফিরা করিবার শক্তি হারাইয়াছে, কিম্বা **অন্ধ**—দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে—তাহারা সকলেই—এক কথায় বলিতে গেলে—জগদ্বাসী সমস্ত লোকই সেই প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গেল। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রেমলাভের যোগ্য পাত্র, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন; আর প্রথমে যাঁহাদের ততটুকু যোগ্যতা ছিল না, পঞ্চতত্ত্বের কৃপায় তাঁহারাও সেই যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন।

২৫। **বীজনাশ**—সংসার-বীজের ধ্বংস; কর্ম্মফলের বা মায়াবন্ধনের বিনাশ; উদ্ধার। **পাঁচজনের**—পঞ্চতত্ত্বের।

প্রবল বন্যায় ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য বহু কাল যাবত জলনিমগ্ন থাকিলে সমস্ত শস্য যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেই শস্যের যেমন অঙ্কুরোদ্গমের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত জীব প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হওয়ায় তাহাদের সংসার-বীজ (সংসারে আসা যাওয়ার হেতুস্বরূপ কর্ম্মবন্ধন) বিনষ্ট হইয়া গেল; তাহাদের মায়িক প্রপঞ্চে আসা যাওয়া ঘুচিয়া গেল, তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলে সংসারবন্ধন তো থাকিতেই পারে না; এমন কি, নাম-সঙ্কীর্ত্তনেও সংসারবন্ধন বিনিষ্ট হইয়া যায়, "সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।৩।২০।১০॥"

উল্লাস—জগতের জীবের উদ্ধারই পঞ্চতত্ত্বের অবতারের একটী প্রধান অভিপ্রেত বস্তু; এক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইল দেখিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল।

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল—ব্যাপে ত্রিভুবনে॥ ২৬
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম॥ ২৭
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬। **প্রেমবৃষ্টি**—প্রেমদানকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, উচ্চ নীচ, পবিত্র অপবিত্র, জল স্থল—সর্ব্বত্রই যেমন বৃষ্টির জল পতিত হয়; তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, অহিন্দু, স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, পাপী, পুণ্যাত্মা—সকলেই এই পঞ্চতত্ত্বের নিকটে প্রেম লাভ করিয়াছে।

২৭-২৮। প্রেমবন্যায় ত্রিভুবন প্লাবিত হইলেও বন্যা দেখিয়াই কয়েকজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গিয়াছিল, প্রেমবন্যা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহাদের নাম বলিতেছেন ২৭ পয়ারে।

মায়াবাদী—শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী জ্ঞানমার্গের লোকগণ; ইঁহারা জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া ভক্তি ও প্রেম হইতে বঞ্চিত। **কর্ম্মনিষ্ঠ**—দেহাভিনিবেশবশতঃ কর্ম্মমার্গে নিষ্ঠা আছে যাঁহাদের—সুতরাং যাঁহারা ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান করেন না। ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল; ভগবৎ-সেবার সহিত ইহার সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নাই; কাজেই কর্ম্মনিষ্ঠ লোক ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারেন না। "কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম্ম॥ ১।১।৪৯॥" **কুতার্কিকগণ**—ভগবদ্-বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে তর্ক করেন যাঁহারা, অথবা ভক্তিবিরোধী তর্ক করেন যাঁহারা। ইঁহাদের তর্কদ্বারা ভক্তির আনুকূল্য তো হয়ই না, বরং ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই ইঁহারা ভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে পারেন না। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অচিন্ত্য মহিমার কথাই হয়তো ইঁহারা বিশ্বাস করিবেন না; এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথাও হয়তো বিশ্বাস করিবেন না—যেহেতু, তাঁহাদের বিবেচনানুসারে এসমস্ত বিষয় যুক্তিসিদ্ধ নহে; বাস্তবিক, কোনও যুক্তি দ্বারাই ভগবানের অচিন্ত্যমহিমা স্থাপন করা যায় না; ইহা একমাত্র অনুভবসিদ্ধ বস্তু। অনুভবলব্ধ আপ্ত বাক্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল লৌকিক যুক্তি দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব বা ভগবানের মহিমাদির বিচার করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকেও কুতার্কিক বলা যায়; তাঁহাদেয় যুক্তি কখনও ভগবত্তত্ত্বাদিকে স্পর্শ করিতে পারেনা; সুতরাং ভক্তি বা প্রেমলাভ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। **নিন্দুক**—যাঁহারা নিন্দা করে; দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা বা অসূয়াদির বশীভূত হইয়া, কিম্বা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা পরের কল্পিত বা বাস্তব দোষের কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকেই নিন্দুক বলা হয়। এরূপ নিন্দুকের চিত্ত সর্ব্বদা হীন ভাবে পূর্ণ থাকে বলিয়া তাহাতে ভক্তি-দেবীর স্থান হইতে পারে না; তাই নিন্দুক ব্যক্তি ভক্তি বা প্রেমলাভে অসমর্থ। **পাষণ্ডী**—নাস্তিক, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ বলিয়া পাষণ্ডীগণ ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারে না। **পঢ়ুয়া অধম**—পড়ুয়া (বা ছাত্র) দিগের মধ্যে অধম (বা নিকৃষ্ট) যাহারা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপে বহু সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন টোলে পড়াশুনা করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুতার্কিক, নিন্দুক বা নাস্তিক ছিলেন, তাঁহাদিগকেই "অধম পড়ুয়া" বলা হইয়াছে; কারণ, ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য; "পঢ়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥ চৈতন্যভাগবত। আদি। ৮ম অঃ॥" তাই, কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা হয়। "প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ ২।৮।১৯৯॥" কাজেই যে সমস্ত পড়ুয়া পড়াশুনা করিয়াও কৃষ্ণভক্তি চর্চ্চা করেন না, পরন্তু ভক্তিবিরোধী কুতর্ক, নিন্দা, নাস্তিকাচারেই লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষাই নিরর্থক, তাঁহাদিগকে "অধম পড়ুয়া" বলিলে অসঙ্গত কিছু বলা হয় না। ভক্তি বা প্রেমলাভ ইঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ প্রভৃতিকে প্রেমবন্যা স্পর্শ করিতে পারে নাই; অর্থাৎ তাঁহারা প্রেমলাভ করিতে পারেন নাই; কারণ, কুতর্ক, নাস্তিকতা প্রভৃতির বশে তাঁহারা প্রেমলাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; পরন্তু নিন্দাদি দ্বারা নামাপরাধেই লিপ্ত হইয়াছেন।

তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন—।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ২৯
কেহ কেহ এড়াইল— প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা-সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩০

এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেইসব—মায়াবাদী প্রভৃতি। **মহাদক্ষ**—অত্যন্ত চতুর। বন্যার সূচনা দেখিয়া চতুর লোক যেমন দূরে পলাইয়া যায়, সপার্ষদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমদান-লীলাকে দেশের এবং ধর্ম্মের পক্ষে অনিষ্টজনক মনে করিয়া এই সমস্ত লোকও নামকীর্ত্তনাদি হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন। তাই ব্যঙ্গ করিয়া গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে "মহাদক্ষ" বলিয়াছেন। পাষণ্ডীগণ যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তনকে অমঙ্গল-জনক মনে করিতেন, তাহার প্রমাণ :—"যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন। দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন ॥ দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়। ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥ চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ৮মঅ ॥" "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥ ১।১৭।১৯৭ ॥ হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড় বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ১।১৭।২০৩—২০৪ ॥"

২৯-৩০। তাহা দেখি—মায়াবাদী প্রভৃতি পলাইয়া গেল (অর্থাৎ প্রেম পাইলনা) দেখিয়া। **ডুবাইতে**—প্রেমবন্যায় ডুবাইতে; সকলকে প্রেম দিতে। **এড়াইল**—পলাইয়া গেল; প্রেম পাইল না। **প্রতিজ্ঞা**—সকলকেই প্রেমদানের প্রতিজ্ঞা। জগদ্‌বাসী সকলকেই প্রেমদান করিবেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প ছিল। **রঙ্গ**—কৌশল।

৩১। এত বলি—মনে মনে এইরূপ বলিয়া (চিন্তা করিয়া)। **করিয়া বিচার**—সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে প্রভুর মানসিক বিচার ১।১৭।২৫৩—২৬০ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—পড়ুয়া-আদি আমার নিন্দা করিয়া অপরাধী হইতেছে: এই অপরাধ হইতে মুক্ত না হইলে তাহাদের চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না; অথচ তাহাদিগের অপরাধ মোচনের কোনও উপলক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে না। আমাকে যদি একটা নমস্কার করিত, তাহা হইলে সেই নমস্কারের উপলক্ষ্যেই তাহাদিগকে অপরাধমুক্ত করা যাইত; কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তো তাহারা আমাকে নমস্কার করিবে না। আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে সন্ন্যাসী-জ্ঞানে তাহারা আমাকে নমস্কার করিতে পারে। "অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১।১৭।২৫৮-৫৯ ॥" **সন্ন্যাস আশ্রম** ইত্যাদি—সন্ন্যাসী হইলেন। পরবর্ত্তী ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। যতি ধর্ম্মে—সন্ন্যাস। **পঞ্চবিংশতি** ইত্যাদি—পঁচিশ বৎসর-বয়ঃক্রমকালে (পঁচিশ বৎসরের প্রায় আরম্ভে) প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মধ্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়—"চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ২।১।১১॥" এই পয়ারে "চব্বিশ বৎসর শেষে"-বাক্যে "চব্বিশ বৎসর শেষ বা পূর্ণ হইলে তাহার পরের অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বর্ষের"—এইরূপ অর্থ করিলে বুঝা যায়, পঞ্চবিংশতি-বর্ষের (অর্থাৎ ১৪৩২ শকের) মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থ করিলে আলোচ্য-পয়ারের পঞ্চ-বিংশতি"-শব্দের সহিত সামঞ্জস্য থাকে; কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না। শ্রীমুরারি-গুপ্ত-রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতামৃতম্ বলেন, "ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎ মনীষী। সন্ন্যাস-মন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ॥ ৩।২।১০ ॥" এই শ্লোকেরই মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে বলিতেছেন—"মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে ॥ মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে ॥ মধ্যখণ্ড।"

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদি গণ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাঘমাসের সংক্রান্তিতেই সূর্য্যদেব মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে সংক্রমণ করেন; সুতরাং উদ্ধৃত প্রমাণ দুইটী হইতে মনে হয়, মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর মাত্র প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে "চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। ২।১।১০॥ চব্বিশবৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে। ১।৭।৩২॥ সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশবৎসর অবস্থান। ২।১।১২॥" যদি মনে করা যায় যে, পঞ্চবিংশতি-বর্ষের (১৪৩২ শকের) মাঘমাসেই প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহস্থাশ্রমে পঁচিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমে তেইশ বৎসর (১৪৫৫—১৪৩২=২৩) মাত্র অবস্থান হয়; তাহাতে শ্রীগ্রন্থের উক্তির সঙ্গে বিরোধ জন্মে; কিন্তু যদি মনে করা যায় যে, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের (১৪৩১ শকের) মাঘমাসেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই গৃহস্থাশ্রমে চব্বিশ বৎসর অবস্থান হইতে পারে। কাজেই "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস"-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিতে হইবে:—চতুর্ব্বিংশতি-বৎসরের শেষাংশে (১৪৩১ শকে) যে মাঘমাস।" অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের সংক্রান্তিদিনেই প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, আলোচ্য-পয়ারের "পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে"—বাক্যের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে:—"পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় আরম্ভে।" পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, ১৪৩১ শকাব্দার মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনে শুক্লপক্ষ ছিল। জ্যোতিষের সূক্ষ্মগণনায় জানা যায়, ঐ সংক্রান্তি-দিনে পূর্ণিমাও ছিল; প্রভু ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে পূর্ণিমা তিথিতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষের গণনায় ইহাও জানা যায় যে, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন তারিখে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল; সুতরাং ১৪৩১ শকের ২৩শে ফাল্গুনেই প্রভুর ক্রমলীলায় বয়স চব্বিশ বৎসর শেষ হইয়া পঁচিশ আরম্ভ হইত; তাই সন্ন্যাসের তারিখকে মোটামোটি হিসাবে পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় আরম্ভ বলা যায়, তফাৎ মাত্র ২৩ দিনের। প্রভুর আবির্ভাবের এবং সন্ন্যাসের সময় সম্বন্ধীয় জ্যোতিষের গণনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

৩৩। **কৈল আকর্ষণ**—নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন; নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইলেন এবং নিজের প্রচারিত মতের অনুবর্ত্তী হওয়ার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত করিলেন। **পলাঞাছিল**—পলাইয়াছিল; গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে প্রভুর নিকট হইতে দূরে সরিয়া ছিল এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-মতের অনুসরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। **তার্কিকাদি**—কুতর্কনিষ্ঠ, ভগবদ্‌বিদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

সাধারণতঃ, যাঁহার মনে মুখে এক, যাঁহার মধ্যে আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগ দৃষ্ট হয়, তাঁহার প্রতিই লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মে। লোকে যখন দেখিল—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার নিতান্ত আপনার জনগণকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া সুখের ঘর-সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তাঁহার নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা জননী, যিনি পতি-শোকে ম্রিয়মাণা, যিনি একাদিক্রমে আটটী সন্তানের মৃত্যুজনিত শোকে এবং তৎপরে সর্ব্বগুণ-ভূষিত উপযুক্ত পুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ-জনিত হৃদয়বিদারক দুঃখে জর্জ্জরিত এবং একমাত্র সন্তান শ্রীনিমাইয়ের মুখ দেখিয়াই যিনি এত দুঃখেও জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার ভরণ-পোষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত আপনজন আর কেহই ছিলনা, সেই নিরাশ্রয়া মাতাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন—লোকে যখন দেখিল—মাত্র অল্প কয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয় বার যাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সরলা পতিপ্রাণা এবং স্বামীতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীলা পরমাসুন্দরী কিশোরী ভার্য্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন—লোকে যখন দেখিল—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের মুকুট-মণিরূপে এবং সমগ্র ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত-গণের সহিত বিচার-যুদ্ধে অবিসংবাদিত বিজেতারূপে—ধন সম্পত্তি, যশ, প্রসার-প্রতিপত্তি যত কিছু তিনি পাইতেছিলেন, তৎসমস্তকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া তিনি দীনহীন কাঙ্গালের বেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—তখন সকলেই,—এমন কি যাঁহারা এপর্য্যন্ত শ্রীনিমাই-পণ্ডিতকে ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, বিদ্যাগর্ব্বী-আদি মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ

পঢ়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত॥ ৩৪

অপরাধ ক্ষমাইল,—ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতেন, তাঁহারাও—উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রভুর আন্তরিকতা এবং লক্ষ্য-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার আত্মত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িলেন।

৩৪। **পঢ়ুয়া**—টোলের ছাত্র। **পাষণ্ডী**—ভগবদ্‌বিদ্বেষী। **কর্ম্মী**—কর্ম্মমার্গে রত ব্যক্তিগণ। **নিন্দক**—যাহারা কেবল পর-নিন্দাতেই আনন্দ পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রভু যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন যে সমস্ত পঢ়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী-আদি তাঁহার নিন্দা করিত, প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাহারা সকলেই আসিয়া তাঁহার পদানত হইল।

৩৫। **অপরাধ**—প্রভুর নিন্দাজনিত অপরাধ। **ক্ষমাইল**—ক্ষমা করিলেন (প্রভু)। প্রভুর নিন্দা করাতে তাহাদের যে অপরাধ হইয়াছিল, প্রভুর পদানত হওয়ায় প্রভু তাহাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা করা মাত্রই তাহারা **ডুবিল প্রেমজলে**—ভগবৎ-প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। যতক্ষণ মহতের অবমাননা-জনিত অপরাধ থাকে, ততক্ষণ চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারেনা। **কেবা এড়াইবে** ইত্যাদি—প্রভু যে প্রেমের বিস্তীর্ণ জাল পাতিয়াছেন, কেহই তাহা ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারেনা।

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—প্রেমদান করিবার নিমিত্তই যদি মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যাহারা তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল, তাঁহাদের অপরাধ তিনি গ্রহণ করিলেন কেন এবং অপরাধ গ্রহণ করিলেও গৃহস্থাশ্রমে থাকা কালেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেম দিলেন না কেন? তাঁহার পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখিলেন কেন? তাহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখায় তাঁহার অহমিকা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকাশ পাইতেছে কিনা? ইহার উত্তরে বলা যায় যে—এই ব্যাপারে মহাপ্রভুর অহমিকার বা প্রতিহিংসাপরায়ণতার কিছুই নাই। আসল কথা এই যে, মনের যেরূপ অবস্থায় লোক মহাপ্রভুর ন্যায় ব্যক্তির ধর্ম্ম-প্রচার-মূলক কার্য্যের নিন্দা করিতে পারে, চিত্তের সেই অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভক্তি বা প্রেম হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেনা—কেহ দিলেও চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারেনা; চিত্তের এইরূপ অবস্থাজনিত ব্যবহারে অপরে অপরাধ গ্রহণ না করিলেও চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, চিত্ত ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্য হইতে পারেনা; সুতরাং নিন্দকাদির ব্যবহারে মহাপ্রভুর অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই যে তিনি তাহাদের অপরাধ গ্রহন করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি হয়তঃ তাহাদের অপরাধ গ্রহণই করেন নাই—করিতেও পারেন না; কারণ, তাঁহার উদ্দেশ্য—সকলকে প্রেম দান করা; অপরাধ গ্রহণ করিলে আর প্রেম দিবেন কিরূপে? নিন্দাকারীদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তনের নিমিত্তই বরং তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন। কাহারও চিত্তের পরিবর্ত্তন কেবল বাহির হইতে অপর কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারেনা—ভিতর হইতে পরিবর্ত্তন না হইলে প্রকৃত পরিবর্ত্তনই সম্ভব নহে; ভিতর হইতে এইরূপ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত নিজের ত্রুটীর সম্যক্ অনুভূতি এবং তজ্জন্য তীব্র অনুতাপ একান্ত প্রয়োজনীয়; প্রভুর অপূর্ব্ব আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগ দেখিয়া নিন্দাকারীরা নিজেদের ত্রুটী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল এবং অনুতাপানলে তাহাদের চিত্তের মলিনতা যখন সম্যক্‌রূপে দগ্ধীভূত হইয়া গেল, তখনই তাহাদের অপরাধের বীজ নষ্ট হইল, তখনই তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিল; (প্রভুর পদানত হওয়া দ্বারা তাহাদের অনুতাপই প্রকাশ পাইতেছে); প্রভু যখন দেখিলেন, তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তি গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। তাঁহার পদানত হওয়ার অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই, সুতরাং ইহাতে তাঁহার কোনওরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথাও উঠিতে পারেনা;

সভা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার॥ ৩৬

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ-আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পদানত হওয়ার দ্বারা তাহাদের চিত্তের যে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই অবস্থার অপেক্ষামাত্র তিনি রাখিয়াছিলেন—কারণ সেই অবস্থা না হইলে তাহারা প্রেম গ্রহণ করিতে পারিত না।

এস্থলে কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন—প্রভু যে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, তাহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তিতে বহু লোকেরইতো অপরাধাদি-জনিত চিত্তকল্মষ প্রভুর মুখে হরিনাম শুনামাত্র বা প্রভুর দর্শন মাত্র দূরীভূত হইয়াছে এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের বেলায় প্রভু সেই শক্তি প্রকাশ করিলেন না কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই যে, প্রভুর প্রকটলীলার পরবর্ত্তীকালের জীবদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি পঢ়ুয়া পাষণ্ডী, চাপালগোপাল প্রভৃতির বেলায় অপরাধ-ক্ষালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্রেই যাঁহাদের কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল অপরাধ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। চাপালগোপাল, পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের অপরাধ ছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; তাহাদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া কেবল দৃষ্টি-আদি দ্বারাই যদি তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়া প্রভু কৃতার্থ করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী-কালের লোকগণ মনে করিত—প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে অপরাধাদি গুরুতর অন্তরায় নহে। গুরুতর অন্তরায় হইলে প্রভু তাহাদিগকে প্রেম দিতেন না। এইরূপ মনে করিয়া অপরাধ হইতে দূরে সরিয়া থাকার জন্য লোক সচেষ্ট হইত না। অপরাধবিষয়ে লোককে সতর্ক করার জন্যই প্রভু পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের এবং চাপাল-গোপাল-আদির অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অন্যের কথা তো দূরে, শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়াও প্রভু অপরাধের গুরুত্ব জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬। **সভা**—সকলকে। **কৃপা-অবতার**—কৃপা পূর্ব্বক অবতার, অথবা কৃপার বিগ্রহরূপে অবতার। **চাতুরী**—চতুরতা; কৌশল। নিন্দকদিগের নিস্তারের নিমিত্ত তিনি যে চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ; সন্ন্যাস দেখিয়াই নিন্দকগণ তাঁহার অদ্ভুত আন্তরিকতা ও ত্যাগের পরিচয় পাইয়াছে এবং তাহাতেই তাহাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩৭। **তবে**—তাহার পরে; নিন্দকাদির উদ্ধারের পরে। **ম্লেচ্ছ**—অহিন্দু; অনেক মুসলমান, অনেক কোলভীল আদি পার্ব্বত্যজাতিও প্রভুর ভক্ত হইয়াছিল। **কাশীর মায়াবাদী**—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ—প্রকাশানন্দ-সরস্বতী যাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথেই প্রভু তাঁহাদিগকে প্রেম-ভক্তি দান করেন; তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা মায়াবাদীই ছিলেন; অদ্বৈতবাদের আচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অনুগত সাধকদিগকে **মায়াবাদী**—বলে; তাঁহারা মনে করেন, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; কেবল মায়ার প্রভাবেই ভেদ প্রতীত হইতেছে; সংসারে যে বিভিন্ন বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদের বাস্তব সত্তা কিছুই নাই, এক ব্রহ্ম ব্যতীত কোথায়ও অন্য কোনও বস্তু নাই, থাকিতেও পারে না—মায়ার প্রভাবেই বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্ সত্তার জ্ঞান আমাদের মনে জাগিয়াছে। যখন এই মায়ার প্রভাব ছুটিয়া যাইবে, তখন জীব বুঝিতে পারিবে—যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছিল, তৎসমস্তই মিথ্যা, নিজের যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হইত, তাহাও মিথ্যা; সমস্তই ব্রহ্ম, জীব নিজেকেও তখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবে। এইমতের পোষণকারীরা এইরূপে ব্যবহারিক জগতের সমস্তকেই মায়ার প্রভাব-জাত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলা হয়। জীব-ব্রহ্মে অভেদ মনে করে বলিয়া মায়াবাদীরা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সেব্য-সেবকত্ব-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; কাজেই তাঁহাদের মত ভক্তি-বিরোধী; সুতরাং ভক্তিলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষেও মহাপ্রভুর কৃপার প্রয়োজন ছিল। (প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে—॥ ৩৮
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্তপাঠ—করে সংকীর্ত্তন ॥ ৩৯
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে ॥ ৪০
এ সব শুনিঞা প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪১
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিস্তৃত বিবরণ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একাংশের মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে)।

৩৮। নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাইবার সময় প্রভু কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীতে তখন শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ছিলেন; আর ছিলেন তাঁহার দশ হাজার সন্ন্যাসী শিষ্য। তখনকার দিনে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীই ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের মায়াবাদী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে—বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, প্রতিপত্তিতে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরেই ছিল গৃহী শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের স্থান; শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে নীলাচলে যাইয়াই মায়াবাদী সার্ব্বভৌমকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন; এবার তিনি প্রকাশানন্দের পাটস্থান কাশীতে আসিলেন; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা এবং তাঁহার ভক্তিপ্রচারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; শুনিয়া প্রভুর সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার ভাবই তিনি পোষণ করিতেছিলেন। কাশীতে আসিয়াও প্রভু ঐরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন জানিয়া সশিষ্য প্রকাশানন্দ বিশেষরূপেই বিরক্ত হইলেন—বিরক্ত হইয়া প্রভুর নিন্দা করিতে লাগিতেন। কিরূপ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩৯-৪০। তাঁহারা নিন্দা করিয়া বলিতেন—"শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে? কিন্তু নিতান্ত মূর্খ; তাই মূর্খ ভাবপ্রবণ লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নিজেও ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিতেছে; নিজের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা সে জানে না; বেদান্তপাঠই সন্ন্যাসীর প্রকৃত ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন, নৃত্যগীত—এসব সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে; কিন্তু নিজের মূর্খতাবশতঃ সে বেদান্তপাঠ করে না—করে সঙ্কীর্ত্তন, আর সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে নর্ত্তন!"

গায়ন—গীত। **নাচন**—নৃত্য। **সন্ন্যাসী হইয়া**—তৎকালে যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মায়াবাদী ছিলেন; শঙ্করাচার্য্যকৃত মায়াবাদমূলক বেদান্তভাষ্যই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য ছিল। তাই সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে মনে করিত—ইনি মায়াবাদী; কোনও সন্ন্যাসী যে ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিম্বা মায়াবাদ ব্যতীত অন্য কোনও মতের অবলম্বন করিতে পারেন—এরূপ ধারণা কাহারই ছিল না, স্বয়ং প্রকাশানন্দেরও ছিল না। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিতেন—"সন্ন্যাসী হইয়া নৃত্যগীত করে, বেদান্ত পড়ে না, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! এ নিতান্তই মূর্খ।" **বেদান্ত**—ব্রহ্মসূত্র। কিন্তু তৎকালে (অধিকাংশ স্থলে এখনও) সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত বলিতে বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যই (অথবা শঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তই) বুঝিতেন। **ভাবক**—ভাবপ্রবণ; মানসিক-দুর্ব্বলতা-হেতু অতি সামান্য কারণেই পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যাহারা চঞ্চল বা উতালা হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে ভাবক বা ভাবপ্রবণ লোক বলে। ২।১৭।১১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১। প্রভু এসমস্ত নিন্দার কথা শুনিয়া মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন—কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না; উপেক্ষা করিয়া কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপও করিলেন না। এই উপেক্ষা প্রভুর আত্মম্ভরিতা হইতে জন্মে নাই; ভক্তিবিষয়ে সন্ন্যাসীদের অজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহাদের নিন্দাদির প্রতি কোনওরূপ গুরুত্ব দান করিলেন না। **সম্ভাষণ**—আলাপ।

৪২। বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় প্রভু কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ না করিয়াই বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন; বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে তিনি আবার কাশীতে আসিয়াছিলেন।

কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৩
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৪

সনাতন-গোসাঞি আসি তাহাঁই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা ॥ ৪৫
তাঁরে শিক্ষাইলা সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৩। **লেখক**—গ্রন্থাদি নকল করিয়া (লিখিয়া) যিনি জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তৎকালে ছাপাখানা ছিল না। হাতে লেখা গ্রন্থই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; অনেক লোক এই ভাবে কেবল গ্রন্থ লিখিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিত; চন্দ্রশেখর ছিলেন তাঁহাদের একজন; তিনি ছিলেন জাতিতে শূদ্র। কবিরাজ-গোস্বামী অন্যত্র চন্দ্রশেখরকে বৈদ্য বলিয়াছেন (১।১০।১৫০ এবং ২।১৭।৮৮)। এই পয়ারে অব্রাহ্মণ-অর্থেই শূদ্রশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **স্বতন্ত্র**—স্বাধীন। যিনি কোনও বিধি-নিষেধের বা লোকাচারাদির অধীন নহেন, নিজের ইচ্ছানুসারেই যিনি সর্ব্বদা চলেন, তাঁহাকে বলে স্বতন্ত্র। শূদ্রের দর্শন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ (তাই শূদ্রাভিমানী রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয়। ১।৮।৩৪)"; কিন্তু প্রভু শূদ্র-চন্দ্রশেখরের গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহাতে দর্শন তো দূরের কথা, স্পর্শ পর্য্যন্তও হইত। যাহাহউক, সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শন-বিষয়ে নিষেধ-বিধি থাকা সত্ত্বেও প্রভু কেন চন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান করিলেন, এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন—প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত; তিনি নিজের ইচ্ছায় চলেন—তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি লৌকিক-লীলায় সন্ন্যাসী হইয়াও শূদ্র-চন্দ্রশেখরের ঘরে বাস করিলেন। এইরূপই এই পয়ারের "শূদ্র" ও "স্বতন্ত্র";-শব্দদ্বয়ের সার্থকতা বলিয়া মনে হয়।

অথবা, **স্ব**—স্বীয়, স্বীয়জন, স্বীয়ভক্ত; তদ্দ্বারা তন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েন যিনি, অর্থাৎ যিনি ভক্তাধীন, তিনি স্বতন্ত্র। প্রভু ভক্ত-পরাধীন বলিয়াই চন্দ্রশেখরের ভক্তির বশীভূত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার গৃহে বাস করিলেন। শ্রীভগবান্ যে ভক্তপরাধীন, তাহা তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩॥"

সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শনাদি যে নিষিদ্ধ, ইহা সন্ন্যাসীদের একটা সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক বিধি; আত্ম-ধর্ম্মের তুলনায় সাম্প্রদায়িক বিধি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, প্রভুর আচরণে তাহাও সূচিত হইল।

৪৪। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে থাকিতেন বটে, কিন্তু প্রভু আহার করিতেন ব্রাহ্মণ তপনমিশ্রের ঘরে।

গৃহাস্থাশ্রমে প্রভু যখন বিদ্যাপ্রচারার্থ একবার পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও একস্থানে অবস্থান-কালে এই বৃদ্ধ **তপন-মিশ্রই** প্রভুর নিকটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহাকে নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন; তপন-মিশ্র তখন প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে "প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী॥ তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন॥১।১৬।১৪-১৫॥" এতদিনে প্রভুর সেই বাক্য সফল হইল।

ভিক্ষা—সন্ন্যাসীর আহারকে ভিক্ষা বলে। **সন্ন্যাসীর** সঙ্গে ইত্যাদি—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে, সেই স্থানে যদি (সন্ন্যাসী বলিয়া) প্রভুরও নিমন্ত্রণ হইত, (সম্ভবতঃ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে) প্রভু সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।

৪৫-৪৬। **তাহাঁই**—কাশীতেই। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই গৌড়েশ্বর-হুসেন সাহের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া (মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) শ্রীপাদ সনাতন কাশীতে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু সনাতনের শিক্ষার নিমিত্তই দুইমাস কাশীতে অবস্থান করিলেন

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন।
দুঃখী হঞা প্রভু পায় কৈল নিবেদন— ॥ ৪৭
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৪৯
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫০
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া—।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫১
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈলা নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস—পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫২
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৩
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীর কৃপা-লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৪
সে বিপ্র জানেন—প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং ভক্তিধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম সনাতনকে শিক্ষা দিলেন (মধ্যলীলায় ১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪ পরিচ্ছেদে এই শিক্ষার বিষয় বিবৃত হইয়াছে)।

৪৭-৪৯। এদিকে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন; কাশীতে অবস্থান-কালে ভক্ত-মহলে প্রভুর সুখ্যাতি ও মহিমার কথা ক্রমশঃই অধিকতর প্রচারিত হইতেছিল; তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসীদের নিন্দার মাত্রাও বোধ হয় অধিকতর রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল; যখন-তখনই তাঁহারা প্রভুর নিন্দা করিতেন; এ সমস্ত নিন্দার কথা শুনিয়া প্রভুর অনুগত ভক্তগণের হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কোনও রকমে তাঁহারা আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতেন; কিন্তু শেষ কালে দুঃখ আর সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র একদিন প্রভুকে সমস্ত কথা জানাইলেন; যাহা জানাইলেন, তাহাই এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **হৃদয়-শ্রবণ**—চিত্ত ও কর্ণ।

৫০। চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের কথা প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন; ঠিক এমন সময় এক বিপ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই বিপ্র ছিলেন এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি কাশীতেই বাস করিতেন।

৫১-৫৩। এই বিপ্র সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। দৈন্য-বিনয়ের সহিত প্রভুর চরণে ধরিয়া তিনি প্রভুকে যাহা বলিলেন, তাহা এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসি-গোষ্ঠি—মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে। **মোরে অনুগ্রহ ইত্যাদি**—বিপ্র বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশনা, তাহা আমি জানি; তথাপি (কেবল তোমার কৃপার ভরসায়) তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি—আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, ইহাই মিনতি।"

৫৪-৫৫। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র; হাসিয়া বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসীর কৃপা ইত্যাদি।—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই ভঙ্গী (নিমন্ত্রণ-গ্রহণরূপ ভঙ্গী)।

সে বিপ্র জানেন ইত্যাদি—প্রভু যে অপর কাহারও গৃহেই আহার করেন না, তাহা মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র জানিতেন; জানিয়াও যে তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন—বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে—ইহা কেবলই প্রভুর প্রেরণায়। বিপ্রের গৃহে সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন, ইহাই ছিল প্রভুর গূঢ় সঙ্কল্প; তাই তিনি বিপ্রের চিত্তে নিমন্ত্রণের বাসনা জাগাইলেন এবং তাঁহার উপস্থিতির নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা জানাইবার জন্যও বিপ্রের চিত্তে আগ্রহ জন্মাইলেন। **প্রেরণায়**—আন্তরিক প্ররোচনায়। **অত্যাগ্রহ**—অতি+আগ্রহ; অত্যন্ত আগ্রহ।

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন—বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৬
সভা নমস্করি গেলা পাদপ্রক্ষালনে।
পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৭
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—।
মহাতেজোময় বপু—কোটিসূর্য্যভাস ॥ ৫৮
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন ॥ ৫৯
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্বসন্ন্যাসি প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান— ॥ ৬০
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস—কিবা অবসাদ ? ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৬-৫৭। নিমন্ত্রণের দিন প্রভু সেই বিপ্রের গৃহে যথাসময়ে গেলেন; গিয়া দেখেন—সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বেই আসিয়াছেন; তাঁহারা সকলে এক যায়গায় বসিয়া আছেন। প্রভু দূর হইতে সন্ন্যাসিগণকে নমস্কার করিয়া পাদ-প্রক্ষালন করিতে গেলেন এবং পাদপ্রক্ষালন করিয়া পাদপ্রক্ষালনের যায়গাতেই বসিলেন, সন্ন্যাসীদের সভায় আসিলেন না। **পাদপ্রক্ষালন**—পা ধোওয়া।

৫৮-৫৯। পাদপ্রক্ষালনের স্থানে বসিয়া প্রভু একটু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন; তাহার ফলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মহা-তেজোময় হইয়া উঠিল, অঙ্গ হইতে যেন কোটি সূর্য্যের আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়াই সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন—তাঁহাদের চিত্ত প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইল, প্রভুর প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ-ভাব ছিল, তাহা দূরীভূত হইল—শ্রদ্ধায় তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল—তাঁহারা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিদ্যাগর্ব্বে, সাধন-গর্ব্বে, প্রসার-প্রতিপত্তির গর্ব্বে—সন্ন্যাসীদের চিত্ত বেশ একটু গর্ব্বিত ছিল; তাই তাঁহারা প্রভুর নিন্দা করিতেন। একটু ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ব্যতীত, কেবল দৈন্য-বিনয়ে বোধ হয় কাহারও গর্ব্ব খর্ব্ব হয় না; কাহারও গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হইলে তাহার চিত্তে তাহার নিজের সম্বন্ধে একটু হেয়তার অনুভব জাগাইয়া দেওয়া দরকার। এজন্যই বোধ হয় প্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ স্তম্ভিত হইলেন; পূর্ব্বে তাঁহারা মনে করিতেন—ইনি একজন মূর্খ ভাবুক সন্ন্যাসীমাত্র,—শাস্ত্র জানেনা, ধর্ম্ম জানেনা, আচার জানেনা, বেদান্ত পড়েনা, পড়িতে জানেও না; নিতান্ত সাধারণ লোক। কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে করিলেন—"ও বাবা! ইনি তো সাধারণ লোক নন্? কি তেজ! চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছে!! ইঁহার নিন্দা করিয়া আমরা কত অন্যায় করিয়াছি!! ইঁহার মত শক্তি তো আমাদের নেই!" তখনই তাঁহাদের চিত্ত ফিরিয়া গেল। যদি প্রভু পূর্ব্বের মতনই দৈন্য-বিনয় মাত্র দেখাইতেন, সন্ন্যাসীরা মনে করিতেন—"মূর্খ সন্ন্যাসী, আমাদের সভায় আসিবার সাহস পাইতেছেনা; বাস্তবিক আমাদের সভায় আসিবার যোগ্যতাও তার নাই।" গর্ব্বিত-লোক বিনয়ে মুগ্ধ হয় না; প্রভু যখন দৈন্যবশতঃ পাদ-প্রক্ষালন-স্থানে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মহত্ত্ব সন্ন্যাসীদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের সভায় আহ্বানও করেন নাই। কিন্তু যখন ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, তখনই শ্রদ্ধায় একেবারে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

৬০-৬১। সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনিও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রভুকে বলিলেন—"শ্রীপাদ! এখানে আসুন, সন্ন্যাসীদের সভায় আসিয়া বসুন; ওখানে অপবিত্র স্থানে কেন? কিসের দুঃখ আপনার?"

শ্রীপাদ—সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন। **অপবিত্র স্থানে**—পাদপ্রক্ষালনের স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। **অবসাদ**—অবসন্নতা। "শ্রীপাদ! তোমার মনে এমন কি কষ্ট যে, তুমি দীনহীনের মত এত হীন স্থানে বসিয়া আছ?"—ইহাই ধ্বনি।

প্রভু কহেন—আমি হই হীনসম্প্রদায়।
তোম সভার সভায় বসিতে না জুয়ায়॥ ৬২
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া। ৬৩
পুছিল—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ?
কেশব-ভারতীর শিষ্য—তাতে তুমি ধন্য॥ ৬৪
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি-কারণে আমা সভার না কর দর্শনে॥ ৬৫
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্ত্তন॥ ৬৬
বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম॥ ৬৭
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ ? ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২। প্রভু বলিলেন, "আমি হীন (ভারতী) সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়াছি, তোমরা উচ্চ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী; আমি তোমাদের সভায় বসিবার যোগ্য নই; তাই এখানে বসিয়াছি।"

সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটী সম্প্রদায় আছে—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, ভারতী এবং সরস্বতী। এই সন্ন্যাসীদিগকে দশনামী সন্ন্যাসী বলে। ইহারা শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্য। কথিত আছে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য নাকি কোনও সময়ে কোনও কারণে উল্লিখিত দশটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটীর দণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন—তদবধি ইহারা গুরুত্যাগী হইয়া থাকেন; আর কয়েকটীর দণ্ড অর্দ্ধেক করিয়া দিয়াছিলেন; তদবধি ইহারা **হীন-সম্প্রদায়**-রূপে পরিগণিত হয়েন; ইহাদের মধ্যে ভারতী-সম্প্রদায় একটী; মহাপ্রভু ভারতী-সম্প্রদায়ে (কেশব ভারতীর নিকটে) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে হীন সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত করিলেন।

প্রকাশানন্দের মনে বোধ হয় এইরূপ গর্ব্বও ছিল যে, তিনি উচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী; আর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হীন-ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। এই গর্ব্বের অসারতা প্রকাশানন্দের চিত্তে পরিস্ফুট করার নিমিত্তই বোধ হয় নিজের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াও প্রভু নিজেকে হীন-সম্প্রদায়ী বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

৬৩-৬৮। প্রকাশানন্দ তখন নিজে প্রভুর হাতে ধরিয়া শ্রদ্ধা-সম্মান-সহকারে প্রভুকে সন্ন্যাসীদের সভায় নিয়া বসাইলেন; বসাইয়া একটু উপদেশের ছলেই যেন প্রভুকে যাহা বলিলেন, তাহা এই কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। এই কয় পয়ার হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—প্রকাশানন্দ যে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—গুরুস্থানীয়,—এই অভিমান তাঁহার তখনও যায় নাই।

সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী—সর্ব্বজনানুমোদিত সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং তুমি সামাজিক ব্যবহারের এবং সঙ্গ করার যোগ্য। **এই গ্রামে**—কাশীতে। **সন্ন্যাসী হইয়া** ইত্যাদি—নৃত্য, কীর্ত্তন, ভাব-প্রবণ দুর্ব্বলচিত্ত লোকের সঙ্গে নামকীর্ত্তনাদি—যাহা কোনও সন্ন্যাসীরই কর্ত্তব্য হইতে পারেনা, তাহাই—তুমি করিতেছ। **বেদান্ত পঠন** ইত্যাদি—অথচ, বেদান্ত পাঠ করা, ব্রহ্মের ধ্যান করা প্রভৃতি যাহাই নাকি সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য—তাহা করিতেছ না! **প্রভাবে**—মহিমায়। তোমার যে প্রভাব—ঐশ্বর্য্য—এইমাত্র দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তুমি সামান্য মানুষ নও—তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ; তথাপি কেন তুমি এরূপ অনুচিত হীন কর্ম্ম করিতেছ?

প্রকাশানন্দের কথা হইতে বুঝা যাইতেছে, রঙ্গিয়া প্রভু এখানে এক রঙ্গ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী, তিনি নারায়ণাদি সবিশেষ স্বরূপ স্বীকারই করেন না। এক্ষণে কিন্তু প্রভু অন্তর্যামিরূপে প্রকাশানন্দের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার ভ্রান্তি দূর করিতেছেন, সবিশেষ-স্বরূপ নারায়ণের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মাইতেছেন এবং সেই সাক্ষাৎ নারায়ণই যে সন্ন্যাসিরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত—তাহাও অনুভব করাইতেছেন। কিন্তু এইরূপ অনুভূতি জন্মাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্বীয় প্রভাবে তাহাকে আবার প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন; তাই প্রকাশানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কেন তুমি হীনাচার কর।" (প্রভু যে নারায়ণ, এই অনুভূতি প্রচ্ছন্ন না হইলে হীনাচার সম্বন্ধীয় প্রশ্নই

প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ ! ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন—॥ ৬৯
মূর্খ তুমি তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার ॥ ৭০
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭১
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই—শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে উঠিতে পারে না)। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশের সুযোগ করার নিমিত্তই প্রভু প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এইরূপ ভঙ্গী করিয়াছেন।

৬৯-৭০। প্রভুকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে প্রকাশানন্দ যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রভু একে একে তাহাদের উত্তর দিতেছেন। (পরবর্ত্তী ৯৩ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। প্রকাশানন্দের ধারণা ছিল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী; তাই প্রভুও নিজেকে মূর্খ-বলিয়া প্রকাশ করিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর এই দৈন্যোক্তি প্রকাশানন্দের ধারণার অনুকূল হওয়ায় তিনি মনোযোগ-সহকারে প্রভুর কথা শুনিতে লাগিলেন। প্রভু যদি প্রথমেই প্রকাশানন্দের কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য এবং ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি অপেক্ষা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহা হইলে গর্ব্বিত প্রকাশানন্দের অভিমানে আঘাত লাগিত, প্রভুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি ও অবজ্ঞা তাহাতে আরও বাড়িয়া যাইত; তখন তিনি আর ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত প্রভুর কথা শুনিতে পারিতেন না। তাই প্রভুর এই দৈন্য "সূঁচ হইয়া ঢুকিয়া কুড়াল হইয়া বাহির হওয়ার" ন্যায় প্রতিপক্ষ-জয়ের একটী অপূর্ব্ব কৌশল। বিশেষতঃ ইহা বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারেরও পরিচায়ক। ৬৯—৯২ পয়ারে প্রভুর মুখে প্রকাশানন্দের উক্তির উত্তর ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রভু বলিলেন—"শ্রীপাদ ! আমি মূর্খ; তাহা জানিয়া আমার গুরুদেব বুঝিতে পারিলেন, আমা দ্বারা বেদান্ত-পাঠ সম্ভব হইবে না; তাই তিনি আমাকে বলিলেন—তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর। তাই আমি বেদান্ত পড়ি না, কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন করি।"

এই মন্ত্র—কৃষ্ণমন্ত্র। **সার**—বেদান্তের সার; কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত সাধনের সার, বেদান্তেরও সার। মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ। সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥ সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে। বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগ-মোক্ষৈক-সাধনম্॥ হ, ভ, বি ১।৮৫-৮৬॥ অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণমন্ত্র "সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ।" হ, ভ, বি ১।৮১॥" প্রভু ভঙ্গীতে এখানে জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণমন্ত্র সমস্ত সাধনের সার হওয়ায় ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন; তাই তিনি ধ্যান করেন না এবং বেদান্ত পাঠ করেন না।

৭১-৭২। কৃষ্ণমন্ত্রই যে সার, তাহার হেতু বলিতেছেন। এস্থলে কৃষ্ণনামের প্রসঙ্গই হইতেছে: দশাক্ষরাদি কৃষ্ণমন্ত্রের প্রসঙ্গ এস্থলে হইতেছেনা; সুতরাং এস্থলে **কৃষ্ণমন্ত্র**-অর্থ—কৃষ্ণনামরূপমন্ত্র; কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামের প্রভাবেই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি ঘটে এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারক্ষয় হয়।

নাম বিনু ইত্যাদি—ইহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। **সর্ব্বমন্ত্র সার** ইত্যাদি—যত মন্ত্র আছে, যত যত সাধন-ভজন আছে, তৎসমস্তেরই উদ্দেশ্য প্রথমতঃ সংসার-মোচন, দ্বিতীয়তঃ ভগবৎ-প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণ-নামদ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা পাওয়া যায় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারবন্ধনও ঘুচিয়া যায় বলিয়া—এক কথায়—অন্য সমস্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া—কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার হইল।

৭০-৭২ পয়ার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুরুর উক্তি বলিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন।

এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥ ৭৩

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনং (৩৮।১২৬)—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরের্নামেতি। হরের্নামেত্যাদি। সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি; কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি; কলৌ তদ্‌যজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। দ্বাপরে পরিচর্য্যাদিভি র্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি; কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্যথা ধ্যানগতি রন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং হরিকীর্ত্তনাৎ হসন্ রোদন্ গায়ন্ নর্ত্তন্ হরিং প্রাপ্নোতি॥৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৩। এত বলি—পূর্ব্বোক্ত পয়ারানুরূপ উপদেশ দিয়া (প্রভুর গুরু)। **এই শ্লোক**—নিম্নে উদ্ধৃত "হরের্নাম"-শ্লোক। **শিক্ষাইল**—গুরুদেব শিক্ষা দিলেন। **কণ্ঠে করি**—মুখস্থ করিয়া। হরের্নাম-শ্লোকটী শিখাইয়া গুরুদেব আমাকে (প্রভুকে) আদেশ করিলেন—"এই শ্লোকটী মুখস্থ করিয়া ইহার অর্থ বিচার করিবে।"

শ্লো। ৩। অন্বয়। কলৌ (কলিযুগে) অন্যথা (অন্যরূপ) গতিঃ (উপায়—সাধন) নাস্তি এব (নাই-ই), কেবলং (কেবল) হরের্নাম এব (হরির নামই গতি); কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব, কেবলং হরের্নাম এব; কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব, কেবলং হরের্নাম এব।

অনুবাদ। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরিনামই গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরির নামই গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরির নামই গতি॥ ৩।

অথবা, কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই একমাত্র গতি; কলিতে অন্য গতি নাই, নাই নাই। ৩।

হরিপদ-প্রাপ্তিই সমস্ত যুগের সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। সত্যযুগের সাধন ছিল ধ্যান; ধ্যানদ্বারাই হরিপদ তখন প্রাপ্তি হইত; কিন্তু কলিতে সেই ধ্যানের ব্যবস্থা নাই; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। ত্রেতাযুগের সাধন ছিল যজ্ঞ; যজ্ঞদ্বারাই তখন হরিকে পাওয়া যাইত; কিন্তু কলিতে সেই যজ্ঞের ব্যবস্থা নাই; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। দ্বাপরের সাধন ছিল পরিচর্য্যা; কিন্তু কলিতে সেই পরিচর্য্যার ব্যবস্থা নাই; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগের উপযোগী ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কলিতে না থাকায়—তৎস্থলে কেবলমাত্র হরিনামের ব্যবস্থাই থাকায়—হরিনামই কলির একমাত্র সাধন; হরিনাম ব্যতীত কলিতে অন্য কোনও গতিই—সাধনাই—কার্য্যকরী নহে।

ইহা হইল বৃহন্নারদীয়-পুরাণের অভিমত; শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও ইহা অনুমোদিত; কিন্তু মধ্যের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অন্যান্য-মুখ্য সাধনাঙ্গের মধ্যে পরিচর্য্যা এবং ধ্যানের উপদেশও দিয়াছেন (২।২২।৬৭, ৭০) এবং "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।'—এইরূপও বলিয়াছেন (২।২২।৭৪, ৭৫); এইরূপে বিবিধ-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়া শেষকালে বলিয়াছেন—"এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥" (২।২২।৭৬)। সর্ব্বশেষে এক অঙ্গের সাধনেও যাঁহাদের অভীষ্ট লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও সাধনের উল্লেখমূলক "শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণম্" ইত্যাদি যে শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত নববিধা-ভক্তি-অঙ্গেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই নববিধা-ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অঙ্গও আছে। ইহা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠানেও যখন অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৪
ধৈর্য্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদোন্মত্ত ॥ ৭৫
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৬
পাগল হইলাঙ আমি—ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে— ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"এক অঙ্গ-সাধে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুও যখন তাহা স্বীকার করিতেছেন, তখন বৃহন্নারদীয় পুরাণের "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"—বাক্যের সার্থকতা থাকে কোথায় ?

ইহার সমাধান এইরূপে হইতে পারে—বৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত "হরের্নাম"-শ্লোকের অনুমোদন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহরিনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বব্যাপকতাই স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বব্যাপকতা স্বীকার করিয়া সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেরও উল্লেখ করায়—বিশেষতঃ অন্য অঙ্গের সাধনেও অভীষ্ট প্রাপ্তির অনুমোদন করায় ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হইতেছে যে—শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য সাধনাঙ্গের—সমস্তের বা একের—অনুষ্ঠানেই অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে পারে ; কিন্তু নামের আশ্রয় ব্যতীত অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হইবে না।

এই শ্লোকের প্রভুকৃত ব্যাখ্যা আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ১৯-২২ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৭৪-৭৫। প্রভুর উক্তি। **এই আজ্ঞা**—নামকীর্ত্তনের নিমিত্ত গুরুর আদেশ। **ভ্রান্ত হৈল মন**—জ্ঞানশূন্য হইল ; বস্তুতঃ, নাম ও নামী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় (ভ্রান্ত হইলাম অর্থাৎ) ভুলিয়া গেলাম। ইহা শ্রীনামকীর্ত্তনের একটী মাহাত্ম্য—নাম ও নামী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইতে হয়। নামকীর্ত্তনের ফলে বাহ্য-বিষয়ের নানা শাখা হইতে আকৃষ্ট হইয়া মন একমাত্র নামীতে নিবিষ্ট হয়। সাধকের এই অবস্থা যখন লাভ হয়, তখন সাধারণ সংসারী লোক তাঁহাকে "ভ্রান্ত" বলিয়া মনে করে।

ধৈর্য্য করিতে নারি—ধৈর্য্য রক্ষা করিতে বা আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। **উন্মত্ত**—পাগলের ন্যায়। উন্মত্ত হইলে লোকের যেমন লোকাপেক্ষাদি থাকে না, মান-অপমানের জ্ঞান বা লজ্জা-সরমাদি থাকেনা, নিজের মনের ভাবের প্রেরণায় সে যেমন আপন মনে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও গান করে, কখনও বা নৃত্য করে—নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত যখন বাহ্য-বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়া নাম ও নামী শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহারও লোকাপেক্ষা—লজ্জা-সরম-মান-অপমানাদি-জ্ঞান থাকেনা, নামানন্দের প্রেরণায় তিনিও তখন—কখনও বা হাসেন, কখনও বা কাঁদেন, কখনও বা (কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলাদি) গান করেন, আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। এই সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের বাহ্য-লক্ষণ ; নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত হইতে সমস্ত মলিনতা যখন সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাহাতে হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় ; সেই বিশুদ্ধ চিত্তে এই শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমরূপে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভক্তকে অভিভূত করে ; তাহার প্রভাবেই ভক্ত আত্মহারা হইয়া "হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।" "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ শ্রীভা, ১১৷২৷৪০ ॥"

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে প্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভঙ্গীতে তিনি তাহাই জানাইলেন।

৭৬-৭৭। প্রভুর উক্তি। **জ্ঞানাচ্ছন্ন** হইল আমার—(কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিতে করিতে) আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন (জ্ঞান লুপ্ত) হইল ; আমি হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইলাম। **পাগল হইলাম** ইত্যাদি—আমি পাগল হইয়াছি, তাই মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছিনা।

ভক্তিরাণী যখন চিত্তে পদার্পণ করেন, তখন ভক্তের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব অকপট দৈন্যের আবির্ভাব হয়—তিনি তখন সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে নিতান্ত হীন—অযোগ্য বলিয়া মনে করেন ; তাই তাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি ! কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন—॥৭৯
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে,—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮০
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ৮১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও তিনি তাহা নিজের মনের নিকটেও স্বীকার করেন না; নিজের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশ পায়, তাহাকে তিনি উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। তাই তাহার প্রতীকারের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কখনও গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়েন। এরূপ অবস্থার কথাই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন।

৭৮-৭৯। প্রভু গুরুদেবের চরণে যাহা নিবেদন করিলেন, তাহা এই সার্দ্ধ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **কিবা তার বল**—তাহার (মন্ত্রের) কি অদ্ভুত শক্তি। **করিল পাগল**—আমাকে পাগল করিল। "জপিতেই মন্ত্র মোরে করিল পাগল।" এই পাঠান্তরও আছে। নামকেই এস্থলে মন্ত্র বলা হইয়াছে।

৮০। নিবেদন শুনিয়া গুরুদেব একটু হাসিলেন; হাসিয়া যাহা বলিলেন, তাহা ৮০-৮৯ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই—"তুমি মনে করিয়াছ, তুমি পাগল হইয়াছ; কিন্তু তুমি পাগল হও নাই; তোমার চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই এই যে, যিনিই এই নাম জপ করিবেন, তাঁহার চিত্তেই কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইবে; প্রেমের উদয় হইলে হাসি-কান্নাদি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে।" এইরূপই কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য।

স্বভাব—ধর্ম্ম; স্বরূপানুবন্ধি গুণ। **ভাব**—প্রেম। **উপজয়ে**—উৎপন্ন হয়।

৮১। **কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা**—কৃষ্ণই যে প্রেমের বিষয়; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম প্রযোজিত হয়। **পুরুষার্থ**—পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন; লোকের কাম্যবস্তু। **পরম পুরুষার্থ**—পরম (বা চরম) কাম্য বস্তু; যাহার উপরে কামনার আর কোন বস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই জীবের পরম কাম্য বস্তু; এই বস্তু পাইলে জীবের সকল চাওয়া ঘুচিয়া যায়; ইহা অপেক্ষা লোভনীয় আর কোনও বস্তু নাই ও থাকিতে পারে না। **যার আগে**—যাহার (যে কৃষ্ণপ্রেমের) সাক্ষাতে (বা তুলনায়)। **তৃণতুল্য**—মণি-মাণিক্যাদির তুলনায় তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। **চারি পুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ। কৃষ্ণ-প্রেমের আনন্দ এবং লোভনীয়তা এতই অধিক যে, মণি-রত্নাদির তুলনায় তৃণ (ঘাস) যেমন নিতান্ত তুচ্ছ, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। "মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ। পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ। পূঃ ১।২২॥"

এস্থলে চারি পুরুষার্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। সংসারে নানা রকমের লোক আছে, তাহাদের সকলের রুচি ও প্রকৃতি এক রকম নহে; তাই সকলের কাম্য বা অভীষ্টও এক রকমের নহে। মোটামুটী ভাবে তাহাদের কাম্য বস্তুকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; এই চারিটী শ্রেণীই হইতেছে চারিটী পুরুষার্থ। পর পর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই চারিটী পুরুষার্থের নাম লিখিতে গেলে প্রথমে কাম, তার পর অর্থ, তার পর ধর্ম্ম এবং সর্ব্বশেষে মোক্ষের উল্লেখ করিতে হয়। কাম বলিতে কেবল মাত্র স্থূল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাকেই বুঝায়, ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তুর যথেচ্ছ ভোগব্যতীত যাহারা আর কিছুই জানেনা বা চাহে না, তাহাদের অভীষ্ট বস্তুকেই প্রথম পুরুষার্থ কাম বলা যায়। পশুগণ এইরূপ ইন্দ্রিয়-ভোগ ব্যতীত আর কিছুই জানেনা; মানুষের মধ্যেও পশু-প্রকৃতির লোক আছে, অথবা প্রত্যেক লোকের মধ্যেই পাশব-বৃত্তি অল্পবিস্তর আছে; যাঁহাদের মধ্যে সংযমের অভাব, তাঁহারা এই পশু-প্রবৃত্তিদ্বারাই চালিত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের সংযমহীন স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনাই তাঁহাদের **পুরুষার্থ—কাম**। ইহার পরবর্ত্তী পুরুষার্থ হইল অর্থ। **অর্থ**—বলিতে এস্থলে টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি-আদিকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বুঝায়, এসমস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছাই **দ্বিতীয় পুরুষার্থ।** ইহার উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই ; কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর ভোগ অপেক্ষা ইহা একটু উন্নত ধরণের। পশু অর্থাদি চায়না, অর্থে তার প্রয়োজন নাই ; স্বীয় শিশ্নোদরের তৃপ্তিতেই পশু সন্তুষ্ট ; পশু-প্রকৃতির মানুষেরও তাই। কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহারা লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান প্রভৃতি চাহেন। টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি না থাকিলে লোকসমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি মান-সম্মান পাওয়া যায় না; তাই তাঁহারা অর্থ চাহেন। এসকল লোক স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগও চাহেন, অধিকন্তু মান-সম্মান প্রাপ্তির অনুকূল অর্থাদিও চাহেন। ইঁহাদের পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু হইল অর্থ। তার পর ধর্ম্ম। যাহা ধরিয়া রাখে বা যদ্দ্বারা ধৃত হওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম। যাঁহাদের পুরুষার্থ কেবল কাম, বা অর্থ, তাঁহাদের যদি এরূপ ধর্ম্ম না থাকে, তাহাহইলে পুরুষার্থ-ভোগও সকল সময়ে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়না, অর্থাৎ তাঁহারা ভোগে ধৃত বা রক্ষিত হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা যদি সংযত না হন, কোনও নীতিকে অবলম্বন না করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হন, অবাধ এবং অসংযত স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ইন্দ্রিয়ভোগও অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে, আর অসংযত এবং নীতিহীন হইলে ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িতে পারে, তাহাতে লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি-আদিও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু যদি কেহ সংযম বা নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ, প্রসার-প্রতিপত্তি-আদি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি তাঁহার ভোগে বা পুরুষার্থে ধৃত হইয়া থাকিতে পারেন। এইরূপে দেখা যায়, এই পুরুষার্থের ব্যাপারে সংযম বা নীতিই হইল ধর্ম্ম—যদ্দ্বারা তাঁহার নৈতিক জীবনও উন্নতি লাভ করিতে পারে। যাঁহারা এইরূপ নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ চাহেন, তাঁহাদের পুরুষার্থই হইল ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত কেবল ইহজীবনের ভোগের বা সুখ-শান্তির কথাই বলা হইল। কাম বা অর্থই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহারা ইহজীবনের ভোগ ব্যতীত অপর কিছু চাহেনও না। আর কেবল নৈতিক জীবনের উৎকর্ষই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের ভোগও কেবল ইহজীবনের। কিন্তু নৈতিক জীবনের বাহিরেও ধর্ম্মের ব্যাপ্তি আছে। যাঁহারা পরকালের ভোগও চাহেন—যেমন স্বর্গাদির সুখভোগ—তাঁহারা তদনুকূল কর্ম্মও করিতে পারেন এবং সেই কর্ম্মও তাঁহাদের ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ধর্ম্ম হইতেছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম—বেদ-বিহিত কর্ম্ম। বেদ-বিহিত-কর্ম্মরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহকালের এবং পরকালের সুখভোগ লাভ হইতে পারে; সংযম বা নীতি বেদবিহিত ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। ইহাই হইল **তৃতীয় পুরুষার্থ ধর্ম্ম।** তার পর **চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ।** কাম, অর্থ এবং ধর্ম্ম এই তিনটী পুরুষার্থের লক্ষ্যই হইল দেহের সুখ—পরকালের স্বর্গাদি-সুখও দেহেরই সুখ। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, কেবল ইহকালের ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্যই যাঁহারা লালায়িত—অর্থাৎ কাম এবং অর্থই যাঁহাদের পুরুষার্থ—জন্ম-মৃত্যু হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইতে পারেন না ; এবং শাস্ত্র ইহাও বলেন, পরকালের স্বর্গাদি-সুখভোগের জন্যও যাঁহারা লালায়িত, তাঁহারাও জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না ; পুণ্য কর্ম্মের ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই স্বর্গাদি সুখভোগ পাওয়া যায়। কর্ম্মের ফল শেষ হইয়া গেলে আবার এই সংসারে আসিতে হয়, আবার জন্ম মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়। যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতেও অব্যাহতি লাভের উপায় খোঁজেন। জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভই হইল মোক্ষ—সংসার-মুক্তি। এইভাবে সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের পুরুষার্থই হইল মোক্ষ, ইহাই চতুর্থ পুরুষার্থ এবং চারি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কামই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক, অর্থ যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যা আরও কম। ধর্ম্ম যাঁহাদের পুরুষার্থ তাঁহাদের সংখ্যা তদপেক্ষাও কম, মোক্ষ যাঁহাদের পুরুষার্থ তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম।

ক্রমোৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উল্লিখিত আলোচনায় কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ—এইরূপ পর্য্যায়ে চারি পুরুষার্থের নাম লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণের পর্য্যায় কিন্তু অন্যরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কার্য্য-কারণত্বের কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ এইরূপ পর্য্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম হইল কারণ ; অর্থ তাহার কার্য্য বা ফল। আবার অর্থ হইল কারণ, কাম (ভোগ) তাহার ফল। ধর্ম্ম হইল কারণ, মোক্ষ তাহার ফল।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধর্ম্ম অনেক রকম হইলেও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ভেদে দুই রকমের—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি বলিতে ভোগ-প্রবৃত্তি বা ভোগবাসনা বুঝায়; যে ধর্ম্ম ভোগবাসনার অনুকূল, তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম; যেমন বৈদিক যাগযজ্ঞাদি—যাহার ফলে ইহকালের বা পরকালের ভোগসুখ পাওয়া যায়। ইহকালের বা পরকালের ভোগ্যবস্তুই অর্থ; প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে এই অর্থ লাভ হয়; আবার এই অর্থ বা ভোগ্যবস্তু পাইলেই তাহা ভোগ করার বাসনা হৃদয়ে জাগে, ভোগ করাও হয়; এই ভোগই কাম; এই কাম হইল অর্থের ফল। কিন্তু ভোগে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" তখন আরও ভোগ্য বস্তু পাওয়ার জন্য আবার প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়; তাহার ফলে আবার অর্থ ও কাম; এইরূপেই পরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। "ধর্ম্মস্য অর্থঃ ফলম্, তস্য চ কামঃ ফলম্, তস্য চ ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ, তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মার্থাদিপরম্পরা ইতি। ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য—ইত্যাদি। শ্রীভাঃ ১।২।৯ শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামী।" কিন্তু এই ভোগও অল্পকালস্থায়ী, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইহকালের ভোগ মৃত্যুপর্য্যন্ত, পরকালের স্বর্গাদিসুখভোগ পুণ্যক্ষয় পর্য্যন্ত। ইহাতে সংসার-গতাগতির—সুতরাং সংসার-দুঃখের—নিবৃত্তি হয় না। আবার, ভোগবাসনাকে বাড়িতে না দিয়া ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে শেষকালে একেবারে প্রশান্ত করার চেষ্টামূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানই হইল নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম—যেমন যোগজ্ঞানাদি। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল মোক্ষ। তাহা হইলে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল হইল অর্থ ও কাম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল হইল মোক্ষ। মোক্ষ লাভ হইলে সংসারের গতাগতি বন্ধ হইয়া যায়।

উল্লিখিত চারিটী পুরুষার্থকে চতুর্ব্বর্গও বলে; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটীকে ত্রিবর্গ বলে। সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁহারা ভোগাসক্ত, তাঁহারা সাধারণতঃ ত্রিবর্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন; মোক্ষের কথা তাঁহারা ভাবেন না। এই ত্রিবর্গকে যাঁহারা সমভাবে সেবা করেন, ভোগাসক্তদের মধ্যে তাঁহারাই প্রসংশনীয়। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কেবল অর্থ ও কামের একটীর বা দুইটীরই সেবা করেন, নীতিশাস্ত্র তাঁহাদিগকে জঘন্য বলিয়া থাকে। ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ॥ বস্তুতঃ, ইহাদের অর্থকামাদির সেবা বেশীদিন চলেও না; পূর্ব্বজন্মের সৎকর্ম্মের ফলে ইহজন্মে যাহা পাওয়া যায়, তাহার ভোগ হইয়া গেলেই সব শেষ হইয়া যায়; তখন কেবল অতৃপ্ত ভোগবাসনার জ্বালাই অবশিষ্ট থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নূতন অর্থ (ভোগ্যবস্তু) লাভ হইবে না।

যাঁহারা ভোগাসক্ত, দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভোগেই তাঁহারা আসক্ত। দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদের দেহেতে আসক্তি এবং দেহেতে আসক্তি বলিয়াই দেহের ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে—অর্থকামাদিতে দেহাসক্তি দূর হয় না। স্বর্গাদিসুখও দেহেরই সুখ। দেহেতে আসক্তিবশতঃ তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু, পুনঃ পুনঃ দুঃখদুর্দ্দশা। সামান্য সুখ যাহা কিছু তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাহাও দুঃখসঙ্কুল এবং পরিণামে দুঃখময়। অনাবিল স্থায়ী সুখ বা আত্যন্তিক সুখ ত্রিবর্গকামীদের, ভাগ্যে ঘটে না। অথচ আত্যন্তিক সুখব্যতীত জীবত্মার চিরন্তনী সুখবাসনারও চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না (১।১।৪ শ্লোকটীকায় আদি-লীলার ৮-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই ত্রিবর্গ হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা জড়সুখ; ইহা চিৎস্বরূপ জীবাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন পুরুষার্থের যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ যাঁহারা কামনা করেন, দেহের ভোগের জন্য তাঁহাদের স্পৃহা নাই, দেহটী থাকিলেই দেহের দুঃখসঙ্কুল ভোগের জন্য বাসনা জন্মিতে পারে, সংসার-গতাগতিরও অবসান হইবে না; তাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহারা দেহ হইতে জীবাত্মাকে পৃথক করিয়া, অনাসক্ত করিয়া, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যুক্ত করিতে চাহেন। মোক্ষ যখন তাঁহারা লাভ করেন, তখন তাঁহাদের দেহ থাকে না, সংসার-গতাগতিও থাকে না; শুদ্ধজীবস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা তখন ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন; তাঁহাদের এই অবস্থা স্থায়ী, অবিনশ্বর; এই অবস্থায় থাকিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মসুখ অনুভব করিবেন। ইহা তাঁহাদের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি, আত্যন্তিক সুখ। ইহা জড় সুখ নহে, পরন্তু চিদানন্দ। ত্রিবর্গলভ্য সুখ—জড়সুখ, ক্ষণস্থায়ী, স্বরূপতঃই দুঃখসঙ্কুল; জীবাত্মার সঙ্গে বিজাতীয় বলিয়া স্পর্শশূন্য। ত্রিবর্গলভ্যসুখ সীমাবদ্ধ জড় বস্তু হইতে লভ্য—সুতরাং তাহাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্রহ্মসুখ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইতে লভ্য, তাই সকল বিষয়ে অসীম। এইরূপে দেখা যায়—জাতিতে, পরিমাণে, স্বরূপে এবং স্থায়িত্বে ত্রিবর্গলভ্য সুখ অপেক্ষা চতুর্থপুরুষার্থ-মোক্ষলব্ধ ব্রহ্মসুখের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুষার্থ বলিতে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্থায়ী বৃহত্তম বস্তুকেই বুঝায়; ক্ষণস্থায়ী বস্তু কেহ চায় না; ক্ষুদ্র বস্তুও কেহ চায় না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে চারিপুরুষার্থের মধ্যে কেবলমাত্র চতুর্থ-স্থানীয় মোক্ষেরই পুরুষার্থতা আছে বলা যায়, অপর ত্রিবর্গকে বস্তুতঃ পুরুষার্থই বলা যায় না। তথাপি ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলার হেতু এই যে—প্রথমতঃ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরম-ফলদায়কত্ব না থাকিলেও সাধারণ লোক ইহাদিগকেই অভীষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই তিনটীকে পুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত করাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এগুলিও পুরুষার্থ। সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চায়; বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই দেহরক্ষার প্রয়োজন এবং দেহরক্ষার জন্যও ভোগের প্রয়োজন; আবার ভোগ্যবস্তু লাভ করিতে হইলেও ধর্ম্মের প্রয়োজন। সুতরাং বাঁচিয়া থাকার জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামের যখন প্রয়োজন, তখন এই তিনটীও পুরুষার্থই। কিন্তু কেবল বাঁচিয়া থাকার জন্যই যদি দেহরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই দেহরক্ষার এবং তদুদ্দেশ্যেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করার সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই; পশুও দেহরক্ষার জন্য ব্যস্ত। দেহরক্ষার উদ্দেশ্য যদি আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বা আত্যন্তিক সুখলাভের চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে দেহরক্ষার এবং তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কিছু সার্থকতা থাকিতে পারে; তাই এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করার দ্বিতীয় এবং মুখ্য হেতু এই যে—মোক্ষলাভের অনুকূল-সাধনের উদ্দেশ্যে দেহরক্ষার জন্য যতটুকু ভোগ প্রয়োজন এবং সেই ভোগ (কাম) প্রাপ্তির জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র স্বীকার করিয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামও চতুর্থপুরুষার্থ মোক্ষের সহায়ক হইতে পারে। পুরুষার্থের সহায়ক বলিয়া এই ত্রিবর্গকেও পুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে ধর্ম্মের ফল হইবে অর্থ, অর্থের ফল কাম (ভোগ) এবং ভোগের ফল দেহরক্ষা—যদ্দ্বারা মোক্ষ-সাধন সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং কারণ-কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে পুরুষার্থগুলির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটীই পুরুষার্থ। এইরূপ পর্য্যায়েই শাস্ত্রকারগণ পুরুষার্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন; সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামকে মোক্ষের অনুকূলভাবে অঙ্গীকার করাই শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকতর লোভনীয় বস্তু আছে। এই ব্রহ্মসুখ হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিলাস নাই বলিয়া আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতার বৈচিত্রীও নাই; এই ব্রহ্মসুখ কেবল আনন্দসত্ত্বামাত্র। ইহাতে নিত্য চিন্ময় সুখ আছে, কিন্তু সুখের বৈচিত্রী নাই, তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই; আস্বাদন আছে, কিন্তু আস্বাদন-চমৎকারিত্ব নাই; প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মান আস্বাদন-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া ইহা আস্বাদন-বাসনায় নব-নবায়মানত্ব সম্পাদিত করেনা। তাই ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও পরম-লোভনীয় বস্তু নহে—ইহা অপেক্ষাও লোভনীয় বস্তু আছে।

কি সেই বস্তু, যাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও লোভনীয়? যে বস্তুতে ব্রহ্মত্বের চরমতম অভিব্যক্তি, তাহাই সেই পরম লোভনীয় বস্তু। শ্রুতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বাভাবিক-স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারেই রসত্বেরও তারতম্য (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)। রসত্বের বিকাশ যত বেশী—আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিত্বের এবং লোভনীয়তার বিকাশও তত বেশী। শক্তির বিকাশ ন্যূনতম বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রসত্বেরও ন্যূনতম বিকাশ। আর শক্তির অসমোর্দ্ধ বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে রসত্বেরও চরমতম বিকাশ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেই আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিতার, লোভনীয়তার এবং ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জনিত আনন্দ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে লোভনীয়। এই সর্ব্বাতিশায়ি মাধুর্য্যের আকর্ষকত্ব এতই অধিক যে, ইহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" কেবল ইহাই নহে; "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে।" এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রেমভক্তি—স্ব-সুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম। এই প্রেমের সহিত রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। শ্রুতি॥" শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যানন্দ যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও লোভনীয়, তাহার একটী ব্যবহারগত প্রমাণ এই যে, যাঁহারা আত্মারাম (জীবন্মুক্ত—ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন) শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাঁহারাও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০॥" এবং যাঁহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, ঐ প্রেম লাভের জন্য তাঁহাদের ভজনের কথাও শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। নৃসিংহতাপনী। ২।৫।১৬। শঙ্করভাষ্য।" মুক্তপুরুষদের ভগবদ্ভজনের কথা বেদান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥" এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি ষট্প্রশ্ন্যাং যং সর্ব্বেদেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যমেবেতি প্রাপ্তে—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি—মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত—ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেহপি বস্তু-সৌন্দর্য্যবলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেহপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগত্তুপাসনং সিদ্ধম্।" এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—কোনও শ্রুতি বলেন—মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য, আবার কোনও শ্রুতি বলেন—মুক্তির পরেও উপাসনা কর্ত্তব্য। এই পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এই বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—আপ্রায়ণাৎ—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। তত্রাপি—তত্র (মোক্ষে) অপি (ও)—মোক্ষাবস্থায়ও, অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও উপাসনা করিতে হইবে। হি—যেহেতু, দৃষ্টম্—শ্রুতিতে সকল সময়ের উপাসনার বিধিই দৃষ্ট হয়। মুক্তাবস্থাতেও উপাসনার হেতু এই যে, শ্রুতি বলেন—সর্ব্বাবস্থাতেই, সকল সময়েই, সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও উপাসনা করিবে। শ্রুতিপ্রমাণ এই—সর্ব্বদা এনম্ উপাসিত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে—সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তির পরেও উপাসনার বিধানই বা কোথায়, ফলই বা কি? উত্তর—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলেও এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও, বস্তুসৌন্দর্য্য-প্রভাবেই মুক্তব্যক্তি ভজনে প্রবর্ত্তিত হয়—যেমন পিত্তদগ্ধ ব্যক্তির মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্রীর মিষ্টত্বে (বস্তুসৌন্দর্য্যে) আকৃষ্ট হইয়া মিশ্রীভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে—ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্ভজন করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য। "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ॥"-এই ১।৩।২ বেদান্তসূত্রেও ঐ কথাই জানা যায়। এই সূত্রের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাত্তদেবাক্লেশেন সঙ্গচ্ছতে।—ব্রহ্ম মুক্ত-সাধুদিগের উপসৃপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৩০ পৃঃ"। উক্ত সূত্রের মাধ্বভাষ্যেও বলা হইয়াছে "মুক্তানাং পরমা গতিঃ।—ব্রহ্ম মুক্ত

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥ ৮২
'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা'—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥ ৮৩
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষদিগেরও পরমা গতি।" ইহাতেও বুঝা যায়—রসস্বরূপ পরমব্রহ্মের উপাসনার জন্য মুক্ত পুরুষদিগেরও লালসা জন্মে।

এই পরম-লোভনীয় বস্তুটীর আস্বাদনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ প্রেম হইল তাহাহইলে চতুর্থ পুরুষার্থ-মোক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ দ্বারা যেই বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহাই চরমতম কাম্য বস্তু বলিয়া এই পুরুষার্থটীও হইল **পরম পুরুষার্থ**। তাই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ"—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু। মোক্ষ হইল চতুর্থ-পুরুষার্থ, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং তাহা হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রেমকে বলা হয় **পঞ্চম পুরুষার্থ।**

ব্রহ্মানন্দের ন্যায় কৃষ্ণসেবানন্দও চিদানন্দ; সুতরাং জাতিতে ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণসেবানন্দ একই; অবশ্য আস্বাদন-চমৎকারিত্বাদিতে কৃষ্ণসেবানন্দের পরমোৎকর্ষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটী পুরুষার্থ চতুর্থ পুরুষার্থের তুলনায় সর্ব্ববিষয়েই নিকৃষ্ট—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আবার, কৃষ্ণসেবার আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হইয়া পড়ে গোষ্পদের ন্যায় অতি সামান্য (হরিভক্তিসুধোদয় ।১৪।৩৬)। "পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ তার নহে এক বিন্দু॥ ১।৭।৮২॥" তাই বলা হইয়াছে—প্রেমের তুলনায় "তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ।"

৮২। ভক্তিশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়। ইহা **প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু**—কৃষ্ণপ্রেমজনিত আনন্দরূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য। অমৃত-শব্দদ্বারা প্রেমানন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদনীয়তা ও নিত্যত্ব এবং সিন্ধু-শব্দে তাহার অপরিসীমত্ব সূচিত হইতেছে। সমুদ্রে যেমন অপরিমিত জলরাশি থাকে, কৃষ্ণপ্রেমেও তদ্রূপ অপরিমিত আনন্দ আছে; সমুদ্রের জল যেমন কোনও সময়েই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সতত উপভোগেও প্রেমানন্দ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাও অনির্ব্বচনীয়। **মোক্ষ**—ভগবানের কোনও এক স্বরূপের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তি। এই মোক্ষেও প্রচুর আনন্দ আছে; কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ। **মোক্ষাদি**—মোক্ষ আদি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কৃষ্ণ-প্রেমজনিত আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের জলরাশি মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ একবিন্দু জল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে। মহাসমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জল যত ক্ষুদ্র, প্রেমানন্দের তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ইহাদ্বারা প্রেমানন্দের অপরিসীমত্ব দেখান হইয়াছে। ১।৬।৪০ পয়ারের এবং ১।৭।৮১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩। **কৃষ্ণনামের ফল**—কৃষ্ণনাম জপ করার ফল। **ভাগ্যে** ইত্যাদি—ভাগ্যে তোমার সেই প্রেমা উদয় করিল; তোমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই প্রেমা তোমার চিত্তে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের ফলে যে প্রেমলাভ হয়, তাহার প্রমাণ "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ"—ইত্যাদি শ্রীভা ১১।২।৪০ শ্লোকে।

৮৪। **প্রেমার স্বভাবে**—প্রেমের স্বভাব বা ধর্ম্ম (কর্ত্তা)। **চিত্ত-তনু-ক্ষোভ**—চিত্ত (মন) এবং তনুর (দেহের) ক্ষোভ—চাঞ্চল্য। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা যাঁহার মধ্যে উদিত হয়, তাঁহার চিত্তের এবং দেহের চাঞ্চল্য জন্মায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে প্রবল লোভ জন্মাইয়া থাকে। **কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে**—শ্রীকৃষ্ণের চরণ (অর্থাৎ চরণ-সেবা)-প্রাপ্তির নিমিত্ত।

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৫
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৬
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৮৭
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥ ৮৮
নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন ॥ ৮৯
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইলা মোরে।
'ভাগবতের সার এই' বোলে বারেবারে। ৯০

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪০)—
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং ভজতঃ সংপ্রাপ্তফলভূত-প্রেমভক্তি-যোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং চেষ্টামাহ। এবমেব ব্রতং নিয়মো যস্য সঃ। ভক্তিষ্বপি মধ্যে নামকীর্ত্তনস্য সর্ব্বোৎকর্ষমাহ স্বপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য নামকীর্ত্ত্যা, স্বপ্রিয়স্য যদ্‌ভগবন্নাম তস্য কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন জাতোঽনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ। দর্শনোৎকণ্ঠাগ্নিদ্রুতীকৃতচিত্তজাম্বুনদঃ। অয়ে হৈয়ঙ্গবীনং চোরয়িতুং যশোদাসুতশ্চৌরঃ গৃহং প্রবিষ্টস্তদয়ং ধ্রিয়তামাধ্রিয়তামিতি বহির্জরতীগিরমাকর্ণ্য পলায়িতুং প্রবৃত্তং কৃষ্ণং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তমালক্ষ্য হসতি,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৫-৮৭। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন; এসমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বপয়ারোক্ত চিত্ত-তনু-ক্ষোভেরই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

গায়—কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি গান করে। **ইতি উতি ধায়**—এদিকে উদিকে ধাওয়া-ধাওই করে।

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্‌গদ (স্বর-ভেদ), বৈবর্ণ্যাদি স্বাত্ত্বিক ভাব; ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধে এসমস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **উন্মাদ,** বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য—এসমস্ত ব্যভিচারী ভাব; ভূমিকায় ভক্তিরসপ্রবন্ধে এসমস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

এতভাবে—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত স্বাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-সমূহের প্রভাবে। **নাচায়**—চালিত করে; প্রেমই ভক্তগণকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়—এসমস্ত ব্যাপারে ভক্তগণের নিজেদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। **কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সমুদ্রে**—শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ; তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদিও আনন্দস্বরূপ; এসমস্ত রূপ-গুণ-লীলাদির নিষেবণ-জনিত আনন্দ-চমৎকারিতার সমুদ্রে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তগণকে ভাসাইয়া দেয়।

৮৮। প্রভুর প্রতি প্রভুর গুরুদেব বলিলেন—"তুমি পাগল হও নাই; তুমি পরম-পুরুষার্থ প্রেম পাইয়াছ, তাহার প্রভাবেই হাস, কাঁদ, নাচ, গাও; ভালই হইল—তোমারও ভাল, কারণ তুমি পরম-পুরুষার্থ পাইয়াছ, আর তোমার প্রেমপ্রাপ্তিতে আমিও কৃতার্থ; কারণ, আমার উপদেশ সফল হইল।"

গুরু শিষ্যকে মন্ত্রাদি দান করেন—শিষ্যের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারের নিমিত্ত; সুতরাং শিষ্যের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইলেই মন্ত্রাদি-দানের সার্থকতা এবং তাতেই গুরুরও কৃতার্থতা। তাই, প্রভুর মধ্যে প্রেমের উদয় দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন, "তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ।" **কৃতার্থ**—যাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৮৯-৯০। **উপদেশি**—উপদেশ করিয়া। **তার**—ত্রাণ কর; উদ্ধার কর। ৮০—৮৯ পয়ার প্রভুর গুরুর উক্তি। **এক শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত "এবংব্রতঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক। **শিক্ষাইলা**—শ্রীগুরুদেব শিক্ষা দিলেন।

শ্লো। ৪। **অন্বয়।** এবংব্রতঃ (এইরূপ নিয়মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (স্বীয় প্রিয়-হরির) নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে) জাতানুরাগঃ (জাতপ্রেম) দ্রুতচিত্তঃ (শ্লথহৃদয়) লোকবাহ্যঃ (বিবশ) [সন্] (হইয়া

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্ফূর্ত্তিভঙ্গে সত্যহো প্রাপ্তো মহানিধির্মে হস্তচ্যুত ইতি বিষীদন্ রোদিতি। হে প্রভো কাসি দেহি মে প্রত্যুত্তরমিতি ফুৎকৃত্য রৌতি। ভো ভক্ত ত্বৎফুৎকারং শ্রুত্বৈবায়াতোঽস্মীতি। পুনঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং তমালক্ষ্য গায়তি, অহোহহং কৃতার্থোঽস্মীত্যানন্দেন উন্মাদ উন্মত্তবন্নৃত্যতি। লোকবাহ্যঃ লোকানাং হাস্যপ্রশংসা-সংমানাবমানাদিষ্ববধানশূন্যঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উন্মাদবৎ (পাগলের ন্যায়) উচ্চৈঃ (উচ্চ স্বরে) অথঃ হসতি (হাস্য করে) রোদিতি (রোদন করে) রৌতি (চীৎকার করে) গায়তি (গান করে) নৃত্যতি (নৃত্য করে)।

অনুবাদ। এইরূপ নিয়মে যিনি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্বীয়প্রিয়-হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোদয়-বশতঃ শ্লথহৃদয় ও মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য, কখনও চীৎকার, কখনও গান, আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। ৪।

এবংব্রত—এইরূপ ব্রত (নিয়ম) যাঁহার; শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি"-ইত্যাদি শ্লোকে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরির নামরূপগুণলীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভগবদ্ধর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে; এই শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভগবদ্ধর্ম্মকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া অবিচলিতভাবে যিনি তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই "এবংব্রত" বলা হইয়াছে। **ব্রত**—সর্ব্বাবস্থাতেই অবশ্য-পালনীয় নিয়মকে ব্রত বলে। **স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা**—নিজের প্রিয় নামের কীর্ত্তনদ্বারা। স্বপ্রিয়নাম-শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে—স্ব (স্বীয়) প্রিয় যে শ্রীহরি, তাঁহার নাম (স্ব-প্রিয়ের নাম); অথবা, স্ব (নিজের) প্রিয় যে নাম; শ্রীহরির অসংখ্য নাম আছে; তন্মধ্যে যে নাম যে ভক্তের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই নাম। স্বীয় অভিরুচিসম্মত নামকীর্ত্তনের উপদেশ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বার্থ-শক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ॥ ১১।১৯৮॥ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—যস্য চ যন্নাম্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ। ৩।২০।৪ শ্লোকের এবং ৩।২০।১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে **জাতানুরাগঃ**—জাত হইয়াছে অনুরাগ (প্রেম) যাঁহার; জাতপ্রেম; নিরন্তর নামকীর্ত্তনের ফলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা সম্যক্রূপে দূরীভূত হওয়ায় যাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি জাতানুরাগ বা জাতপ্রেম ভক্ত। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ ২।২২।৫৭॥" **দ্রুতচিত্তঃ**—প্রেমের উদয় হওয়াতে প্রেমের প্রভাবে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত (দ্রুত) হইয়াছে। প্রেমোদয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির নিমিত্ত ভক্তের হৃদয়ে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে; তীব্র অগ্নিতাপে স্বর্ণ যেমন গলিয়া যায়, বলবতী উৎকণ্ঠারূপ অগ্নির উত্তাপেও ভক্তের চিত্ত তদ্রূপ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সেই তীব্র-উৎকণ্ঠার ফলে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ে আর ভক্তের কোনওরূপ অভিনিবেশ থাকে না; তাই তখন তিনি **লোকবাহ্যঃ**—লোকাপেক্ষা-শূন্য, মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশূন্য হইয়া যায়েন; "আমার এইরূপ আচরণ দেখিয়া লোকে আমাকে কি বলিবে"—ইত্যাদি বিচারই তখন তাঁহার মনে স্থান পায় না। **উন্মাদবৎ**—পাগলের ন্যায়। কোনওরূপ লোকাপেক্ষা না করিয়া যাহা মনে আসে, তাহাই যে ব্যক্তি বলে বা করে, তাহাকেই সাধারণতঃ লোকে উন্মাদ বা পাগল বলে। জাতপ্রেম ভক্তের আচরণও তদ্রূপ; কিন্তু তিনি উন্মাদ নহেন। উন্মাদের ও জাতপ্রেমভক্তের মোটামোটি প্রভেদ এই যে, উন্মাদের লোকানপেক্ষা তাহার মস্তিষ্কবিকৃতির ফল; কিন্তু জাতপ্রেম-ভক্তের লোকানপেক্ষা মস্তিষ্কবিকৃতির ফল নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ঐকান্তিক নিবিষ্টচিত্ততার—অন্য সমস্ত বিষয় হইতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চিত্তবৃত্তিসমূহের কেন্দ্রীভূততার—ফল। মানাপমানাদি-বিষয়ে জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তবৃত্তির গতি থাকে না বলিয়াই সেই সকল বিষয়ে তাঁহার অনবধানতা; কিন্তু উন্মাদের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশক্তিই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; তাই কোনও বিষয়ে অবধানের ক্ষমতা তাহার থাকে না। জাতপ্রেমে চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশক্তি

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি ॥ ৯১
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৯২
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নষ্ট হয় না, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় মাত্র; তাই অন্য বিষয়ে তাহার গতি থাকেনা। কিন্তু উন্মাদে সেই শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়। অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়ের লক্ষণই প্রায় এক রকম, তাই জাতপ্রেম-ভক্তকে "উন্মাদ" না বলিয়া "উন্মাদবৎ" বলা হইয়াছে। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্ত প্রায়শঃই শ্রীকৃষ্ণের কোনও না কোনও এক লীলায় আবিষ্ট থাকে; আবিষ্ট-অবস্থায় তাঁহার অনুভূতি এইরূপ যে, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানে তাঁহারই সান্নিধ্যে আছেন; হয়তো বা লীলার আনুকূল্যও করিতেছেন। এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাঁহার জ্ঞান থাকে না; তাই এই জগতের কোনও বিষয়েই তাঁহার অবধান থাকে না। **হসতি**—হাস্যোদ্দীপক কোনও লীলার স্ফূর্ত্তিতে জাতপ্রেম-ভক্ত কখনও বা হো-হো-শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে থাকেন। বালক-শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করিবার নিমিত্ত হয়তো কোনও গোপীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; গৃহস্বামিনী বৃদ্ধা-গোপী হয়তো তাহা টের পাইয়া "ননী-চোরাকে ধর, ননী-চোরাকে ধর"-ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিতেছেন; তাহার শব্দ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ভয়ে পলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে এই লীলার স্ফূর্ত্তি হইলে, পলায়নরত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না; তাই হাসিয়া ফেলেন। **রোদিতি**—রোদন করেন। পূর্ব্বোক্ত ননীচুরি-লীলার স্ফূর্ত্তিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেন সাক্ষাতেই পাইয়াছিলেন; সেই স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইলে সাক্ষাতে আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অতিদুঃখে তিনি হয়তো "হায়! হায়! কোথায় গেল? এইমাত্র এখানে ছিল, এখন কোথায় গেল? আমি করতলে মহানিধি পাইয়াছিলাম, কোন্ স্থানে কিরূপে তাহা হস্তচ্যুত হইল? কি করিব? কোথায় যাইব?"-ইত্যাদি বলিতে বলিতে বিরহার্ত্তিভরে রোদন করিতে থাকেন। **রৌতি**—চীৎকার করেন। কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া "হে প্রভো! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও, আমার কথার উত্তর দাও" ইত্যাদি বলিয়া হয়তো চীৎকার করিতে থাকেন। **গায়তি**—রূপ-গুণ-লীলাদি গান করেন, শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া **নৃত্যতি**—নৃত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া আনন্দাতিশয্যে হয়তো নৃত্য করিতে থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে—জাতপ্রেম-ভক্তের হাস্য-রোদন-নৃত্য-গীতাদি তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে; ভূতে পাওয়া লোক যেমন নিজের বশে কিছু করে না, জাতপ্রেম ভক্তও স্ব-ইচ্ছায় এরূপ আচরণ করেন না; বাজিকর যেমন পুতুলকে নাচায়, প্রেমও তেমনি জাতপ্রেম ভক্তকে দিয়া নৃত্যাদি করাইয়া থাকে। ভক্ত বিবশচিত্তে এসব করিয়া থাকেন। অথবা, প্রেমের উদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহারই প্রেরণায় ভক্ত কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও চীৎকার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ৮৫ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯১-৯২। **তাঁর বাক্যে**—গুরুর বাক্যে। **এই তাঁর বাক্যে**—৮০-৮৯ পয়ারোক্ত গুরুবাক্যে। **দৃঢ় বিশ্বাস করি**—সংশয়শূন্য হইয়া। তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া। বস্তুতঃ গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে ভজনে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

৯৩। **ব্রহ্মানন্দ**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভব-জনিত আনন্দ। **খাতোদক**—ক্ষুদ্র খাতের জল; গোষ্পদ। নামসঙ্কীর্ত্তন-জনিত আনন্দের সঙ্গে ব্রহ্মানুভব-জনিত আনন্দের তুলনা করা হইয়াছে। নামসঙ্কীর্ত্তনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাকে মহাসমুদ্র মনে করিলে, ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দকে অতিক্ষুদ্র গোষ্পদ (নরম মাটীতে গরুর পায়ের চাপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে ক্ষুদ্র গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে পরিমাণ জল থাকিতে পারে, সেই জলের) তুল্য মনে করিতে হয়। নামসঙ্কীর্ত্তনজনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ অতি সামান্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মানন্দ স্বরূপতঃ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু নহে; ব্রহ্মেআনন্দ-বৈচিত্রী না থাকিলেও অপরিসীম আনন্দ আছে; কিন্তু কৃষ্ণনামের আনন্দ—পরিমাণে, বৈচিত্রীতে ও আস্বাদন-চমৎকারিতায়—তাহা অপেক্ষা কোটীকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য। অবশ্য, বিষয়-মলিন-চিত্ত সাধারণ জীব এই সঙ্কীর্ত্তনানন্দের এক কণিকাও অনুভব করিতে পারেনা। ইহা একমাত্র জাতপ্রেম ভক্তেরই আস্বাদনের বিষয়, (জাত-প্রেম ভক্তের বিষয় বলিতে বলিতেই এই পয়ার বলা হইয়াছে; তাহা হইতেই এইরূপ মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়)। বিষয়-মলিন চিত্তে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দও অসম্ভব, ব্রহ্মানন্দও অসম্ভব। কারণ, হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ব্যতীত ভগবদানন্দের অনুভবই হইতে পারেনা; মলিন চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবও হইতে পারেনা।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬৫-৬৮ পয়ারে প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভুকে যাহা বলিলেন, বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে এই পাঁচটী প্রশ্ন পাওয়া যায়:—(১) তুমি আমাদের নিকট আসনা কেন? (২) সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নৃত্যাদি কর কেন? (৩) বেদান্ত পাঠ করনা কেন? (৪) ধ্যান করনা কেন? (৫) ভাবকের সঙ্গে ভাবকের কর্ম্মরূপ হীনাচার কর কেন?

৬৯-৯৩ পয়ারে প্রভু ভঙ্গীক্রমে এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন; উত্তরগুলির মর্ম্ম এই:—(১) তোমরা পণ্ডিত; আর আমি মূর্খ; তাই তোমাদের নিকটে যাইনা, তোমাদের সঙ্গ করিনা—আমি অযোগ্য বলিয়া। (প্রকৃত কথা এই যে, পাণ্ডিত্যাদির অভিমান পোষণ করা তো দূরে, যাহারা সেই অভিমান পোষণ করে, তাহাদের সঙ্গও ভক্তিমার্গের প্রতিকূল—ইহাই প্রভু জানাইলেন)। (২) কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তে যে প্রেমের উদয় হয়, সেই প্রেমই আমাকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়—আমি নিজের ইচ্ছায় হাসি-কাঁদিনা। (৩) আমি মূর্খ, বেদান্ত-পাঠে আমার অধিকার নাই; তাই বেদান্ত পাঠ করি না। (কৃষ্ণ-নামই সর্ব্বশাস্ত্রের—বেদান্তের সার; সুতরাং কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে স্বতন্ত্রভাবে আর বেদান্ত-পাঠের প্রয়োজন থাকেনা—ইহাই মর্ম্ম)। (৪) আরাধ্যের রূপ চিন্তাই ধ্যান; তজ্জন্য মনের স্থিরতা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল, ধৈর্য্য নষ্ট হইল, জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আমি "হৈলাম উন্মত্ত।" আমার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব। (কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ফলে যে প্রেম জন্মে, তাহাই ভক্তের মনকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে সম্যক্‌রূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখে; ইহাই ধ্যানের চরম-পরিণতি।—ইহাই প্রভুর বাক্যের সার মর্ম্ম)। (৫) যাহাদিগকে তুমি ভাবক বল, আমার গুরুদেব তাঁহাদিগকেই ভক্ত বলেন; গুরুর আদেশেই আমি তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করি; তাহার ফলে নিজের উপরে আমার নিজের কর্তৃত্ব লোপ পায়; ভক্তসঙ্গে নামকীর্ত্তনের প্রভাবেই আমি গ্রহাবিষ্টের ন্যায় নৃত্য-গীতাদি "হীনাচার" করিয়া থাকি—নিজের ইচ্ছায় করিনা। (প্রকাশানন্দের ন্যায় অভিমানী জ্ঞানমার্গের সাধকগণ প্রেমিক ভক্তের আচরণকে ভাবুকতাময় হীনাচার বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ তাহা হীনাচার নহে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যে প্রেমের বশীভূত, সেই প্রেমের কৃপাতেই ভক্তগণ ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচরণ—কৃষ্ণপ্রেমের বহির্বিকার মাত্র—যে কৃষ্ণপ্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ, সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের ন্যায় অতি সামান্য। তাঁহাদের আচরণ হীনাচার নহে—ইহাই প্রভুর উত্তরের মর্ম্ম)। পঞ্চম প্রশ্নটী বস্তুতঃ স্বতন্ত্র প্রশ্ন নহে; প্রথম চারিটী প্রশ্নের লক্ষ্যীভূত আচরণগুলিই প্রকাশানন্দের মতে হীনাচার এবং প্রভুর উত্তরে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই সমস্ত আচরণ হীনাচার নহে—পরন্তু সদাচার।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ ৫

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুর বচন—॥৯৪
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥ ৯৫
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ॥ ৯৬
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন—
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন॥ ৯৭
ইহা শুনি বোলে সর্ব্বসন্ন্যাসীর গণ—।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ ৯৮
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥ ৯৯
তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ ১০০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্রাহ্মাণীত্যত্র পারমেষ্ঠ্যানীতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং পরব্রহ্মানন্দৈনৈব তস্য তারতম্যং শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধমিতি তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দেত্যাদিভিঃ॥ শ্রীজীব॥ ৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে জগদ্গুরো (হে জগদ্গুরো ভগবন্)! ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দরূপ সমুদ্রে অবস্থিত) মে (আমার নিকটে) ব্রাহ্মাণি (ব্রহ্ম-সম্বন্ধি-আনন্দ সমূহ) অপি (ও) গোষ্পদায়ন্তে (গোষ্পদতুল্য মনে হইতেছে)।

অনুবাদ। প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন—"হে জগদ্গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি অবস্থিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার নিকটে গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে। ৫।"

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ-সমুদ্রকে **বিশুদ্ধাব্ধি**—বিশুদ্ধ সমুদ্র বলা হইয়াছে; বিশুদ্ধ-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ জড়জগতের প্রাকৃত আনন্দ নহে—ইহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়—হ্লাদিনীর পরিণতি-বিশেষ। প্রাকৃত আনন্দ প্রাকৃত সত্ত্বের ক্রিয়া মাত্র। **ব্রাহ্মাণি**—ব্রহ্মানন্দ-সমূহ; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলে। আর ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দকে পরব্রহ্মানন্দ বলে।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ অতি ক্ষুদ্র, তাহার প্রমাণই এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। হরিভক্তিসুধোদয়ের এই শ্লোকটী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে ১ম লহরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে (২৬ শ্লোক)।

৯৪—৯৬। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মনের পরিবর্ত্তন হইল; শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাদির প্রতি সন্ন্যাসীদের অবজ্ঞার ভাব ছিল; প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহাদের সেই অবজ্ঞার ভাব দূর হইল। তাঁহারা বলিলেন—"কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা, ইহা সত্য; তুমি কৃষ্ণভক্তি কর, তাতে দোষ কিছু নাই; ইহা বরং ভালই। মূর্খ বলিয়া বেদান্ত পাঠ করিতে পার না, তাহাও মানিলাম; কিন্তু পাঠ করিতে না পারিলেও আমাদের নিকটে বেদান্ত শুনিতে পার ত? তাহা শুন না কেন? বেদান্ত-শ্রবণে কি দোষ থাকিতে পারে?"

৯৭। দুঃখ না মানহ—যদি মনে কষ্ট না নেও। সন্ন্যাসীরা বেদান্তের যে অর্থ গ্রহণ করেন, প্রভু সেই অর্থের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; তাহাতে সন্ন্যাসীদের মনে কষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই প্রভু এইরূপ বলিলেন।

৯৮—১০০। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা বলিলেন—"দেখিতে তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণের ন্যায় মনে হয়; তোমার মধুর বচনে কর্ণ তৃপ্ত হয়, তোমার সৌন্দর্য্যে নয়ন জুড়ায়; তোমার প্রভাবে সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে; তুমি যাহা বলিবে, তাহা কখনও অসঙ্গত হইতে পারে না; সুতরাং কেন তোমার কথায় দুঃখ মানিব? যাহা বলিতে চাহ, নিঃসঙ্কোচে তাহা বল।"

প্রভু কহে—বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ॥ ১০১
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ১০২
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম-মহত্ত্ব॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০১। প্রভু বলিলেন—"বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরের বাক্য; শ্রীনারায়ণই বেদব্যাসরূপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।" প্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদান্ত-সূত্রের পঠনে বা শ্রবণে কোন দোষ থাকিতে পারে না।

শ্রীভগবানই পরাশর হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীভা, ১৷৩৷২১)। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্—ব্যাসদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। শ্রীভা, ১১৷১৬৷২৮॥" বিষ্ণুপুরাণ বলেন— "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া জানিবে। ৩৷৪৷৫।" এসমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণের বলেই বলা হইয়াছে—"ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ।" বেদব্যাস কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই বেদান্ত-সূত্রকার। বেদান্ত-সূত্রে ৫৫৫টী সূত্র আছে; ইহাকে ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্রও বলে।

১০২। ভ্রম-প্রমাদাদির অর্থ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৭২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **ঈশ্বরের বাক্যে** ইত্যাদি—১৷২৷৭২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদান্ত-সূত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ গুলি থাকিতে পারে না।

১০৩। **উপনিষৎ**—বেদের জ্ঞানকাণ্ডমূলক গ্রন্থগুলিকে উপনিষৎ বলে। ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক প্রভৃতি নামে অনেক উপনিষৎ আছে। উপনিষৎ-সমূহে প্রধানতঃ ব্রহ্মের তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে। **উপনিষৎ সহিত**—উপনিষদের প্রমাণ সহিত; উপনিষদের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। **সূত্র**—সারার্থবিশিষ্ট অল্পাক্ষরময় বাক্যকে সূত্র বলে; সূত্র অতি ক্ষুদ্র একটী বাক্য; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে। ব্যাসদেব-কৃত বেদান্ত-সূত্র-নামক গ্রন্থখানি এরূপ কতকগুলি (৫৫৫টী) সূত্রের সমষ্টি মাত্র। এই পয়ারে সূত্র-শব্দে "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-প্রভৃতি বেদান্তের সূত্রকে বুঝাইতেছে।

মুখ্যবৃত্তি—কোনও শব্দের স্বাভাবিক-শক্তিদ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, শব্দটী উচ্চারণ করা মাত্র তাহার যে অর্থ মনে উদিত হয়, তাহাকে বলে ঐ শব্দের মুখ্যার্থ এবং শব্দের যে বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে মুখ্যবৃত্তি। যেমন, গো-শব্দ উচ্চারণ করিলেই সাস্না (অর্থাৎ গলকম্বল—গলার নীচে লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়া থাকা চর্ম্মাচ্ছাদিত মাংসখণ্ড-বিশেষ), পুচ্ছ, শৃঙ্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু-বিশেষের কথা মনে পড়ে; এই জন্তু-বিশেষই হইল গো-শব্দের মুখ্যার্থ; এবং গো-শব্দের যে বৃত্তি দ্বারা এই অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে গো-শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। আবার, যে ধাতু ও প্রত্যয়যোগে কোনও শব্দ নিষ্পন্ন হয়, সেই ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে শব্দটীর যে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাও সেই শব্দের মুখ্যার্থ এবং যে বৃত্তিদ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকেও মুখ্যাবৃত্তি বলে। যেমন পচ্-ধাতুর উত্তর ণক্ প্রত্যয় যোগে পাচক-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; পচ্-ধাতুর অর্থ পাক করা, রন্ধন করা; আর ণক্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে; সুতরাং ধাতু ও প্রকৃতির অর্থযোগে পাচক-শব্দের অর্থ হইল পাককর্ত্তা, রন্ধনকর্ত্তা; ইহাই পাচক-শব্দের মুখ্যার্থ। মুখ্যার্থকে **অভিধাবৃত্তির** অর্থও বলা হয়। অভিধা ন্যায়মতে শব্দশক্তিঃ। মীমাংসামতে বিধিসমবেতবিধিব্যাপারীভূতপদার্থঃ। তস্যা লক্ষণম্—স মুখ্যোঽর্থস্তত্রাস্য মুখ্যোব্যাপারোঽস্যাভিধোচ্যতে। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাব্যপ্রকাশবচনম্॥ **পরম মহত্ত্ব**—পরম মহান্; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক।

উপনিষদের প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করা যায়, তাহাই সত্য; এইরূপ অর্থে বেদান্ত-সূত্র হইতে যে তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। প্রভুর অভিপ্রায় এই যে, মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-সূত্রের পাঠে বা শ্রবণে কোনও দোষ থাকিতে পারে না।

গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। | তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৪। শব্দের তিনটী বৃত্তি—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যাবৃত্তির তাৎপর্য্য পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। **লক্ষণা**—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা। অলঙ্কারকৌস্তুভ। ২।১২।" যেমন, "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।" এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে ভাগীরথী-নাম্নী নদী-বিশেষকে বুঝায়; তাহা হইলে মুখ্যার্থে উক্ত বাক্যটীর অর্থ এইরূপ হয়—"ভাগীরথী-নাম্নী নদীর মধ্যে ঘোষ বাস করে।" কিন্তু নদীর মধ্যে বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য) অর্থের সঙ্গতি হয় না—মুখ্য অর্থের বাধা জন্মে। তাই, গঙ্গা-শব্দের "গঙ্গাতীর" অর্থ করিতে হইবে—কারণ, গঙ্গাতীরে বাস করা সম্ভব—গঙ্গাতীর গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্টও বটে। তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে—"গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে।" এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা লব্ধ অর্থ। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়; মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ করা হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণালব্ধ অর্থ অসঙ্গত হইবে; কারণ, অর্থ করার এইরূপ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। লক্ষণার বহু প্রকারভেদ আছে; শ্রীপাদজীবগোস্বামী তিন রকম লক্ষণার কথা বলিয়াছেন—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা এবং জহদজহৎস্বার্থা (সর্ব্বসংবাদিনী)। **অজহৎস্বার্থা**—ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা; যে লক্ষণায় পদগুলি নিজেদের অর্থ পরিত্যাগ করে না; যেমন "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্—কাকসমূহ হইতে দধি রক্ষা কর।" এইরূপ আদেশ যদি কাহাকেও করা হয়, তাহা হইলে তিনি যে কেবল কাক হইতেই দধিকে রক্ষা করিবেন, তাহা নহে; বিড়াল, কুক্কুরাদি যাহা কিছু দধি নষ্ট করিতে আসিবে, তাহা হইতেই তিনি দধিকে রক্ষা করিবেন। মূল উদ্দেশ্য হইল দধি রক্ষা করা। এস্থলে কাক-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি হয় না; যেহেতু মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে কেবল কাকের উৎপাত হইতেই দধিকে রক্ষা করিতে হয়, অন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করা চলে না; ফলতঃ দধি রক্ষিত হইবে না। তাই, মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়া কাক-শব্দে কাক এবং কাকেরই ন্যায় অন্য উপদ্রবকারী জন্তু হইতেও দধিকে রক্ষা করিতে হইবে। এস্থলে কাক-শব্দের অর্থে কাক তো থাকিবেই, দধি নষ্ট করিতে পারে এরূপ অন্য জন্তুকেও বুঝিতে হইবে। কাক-শব্দ স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিল না এবং অর্থের আরও ব্যাপকতা ধারণ করিল। তাই উক্ত দৃষ্টান্তটী হইল অজহৎস্বার্থা লক্ষণার দৃষ্টান্ত। **জহৎস্বার্থা**—জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাম্; যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ পরিত্যাগ করে, তাহাকে জহৎস্বার্থা লক্ষণা বলে। যেমন, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"—মঞ্চসমূহ চীৎকার করিতেছে। ইহা হইল "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"-বাক্যের মুখ্যার্থ; কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় না; কারণ, মঞ্চ (বা মাচা) চীৎকার করিতে পারে না; তাই মঞ্চ-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মঞ্চ-শব্দের মঞ্চ (বা মাচা) অর্থ গ্রহণ না করিয়া "মঞ্চস্থ পুরুষ"-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; মঞ্চস্থ লোকগণ চীৎকার করিতেছে—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। মঞ্চস্থ লোকগণ মঞ্চের (মুখ্যার্থের) সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া এস্থলে লক্ষণা হইল এবং মূলশব্দ স্বকীয় (মঞ্চ) অর্থ ত্যাগ করিল বলিয়া জহৎস্বার্থা লক্ষণা হইল। পূর্ব্বে যে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে"-বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার "গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে"—অর্থও জহৎস্বার্থা লক্ষণা-লব্ধ। গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া "গঙ্গাতীর"-অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। **জহদজহৎস্বার্থা**—বাচ্যার্থৈকদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তির্লক্ষণা (বাচস্পতিমিশ্র)। যত্র বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ত্ততে তত্র জহদজহল্লক্ষণা (বেদান্তপ্রদীপ)। যে লক্ষণায় কোনও শব্দের মুখ্যার্থের এক অংশ ত্যাগ করিয়া অন্য অংশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে বলে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা। মায়াবাদীরা তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে এই জহদজহল্লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তত্ত্বমসি—তৎ (সেই-ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। তৎ-শব্দে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট চৈতন্যকে (ব্রহ্মকে) বুঝায়; ত্বম্-পদে অল্পজ্ঞ চৈতন্যকে (জীবকে) বুঝায়। চৈতন্য-স্বরূপে উভয়ের মধ্যে অভেদ আছে বটে;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের অভেদত্ব স্থাপন করা যায় না। তৎ এবং ত্বম্ শব্দদ্বয়ের মুখ্যার্থে এস্থলে ভেদই প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু একজন (ব্রহ্ম) হইলেন সর্ব্বজ্ঞ এবং অপরজন (জীব) হইলেন অল্পজ্ঞ; ভেদ অনেক। উভয়ের অভেদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে তৎ (ব্রহ্ম)-শব্দের মুখ্যার্থ হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং তদ্রূপ ত্বম্ (জীব)-শব্দেরও মুখ্যার্থ হইতে অল্পজ্ঞত্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ করিলে, তৎ-শব্দেও চৈতন্য বুঝায় এবং ত্বম্-শব্দেও চৈতন্য বুঝায়; অর্থাৎ তৎ এবং ত্বম্ এই উভয় শব্দেরই একই চৈতন্য-অর্থ পাওয়া যায়; উভয়েই চৈতন্য বলিয়া উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। এইরূপ অর্থ করিয়াই মায়াবাদীরা তত্ত্বমসি-বাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করেন। তৎ-শব্দের মুখ্যার্থ "সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য" হইতে এক অংশ "সর্ব্বজ্ঞ" ত্যাগ করিয়া অপর অংশ "চৈতন্য" গ্রহণ করা হইল বলিয়া এবং ত্বম্-শব্দেরও মুখ্যার্থ "অল্পজ্ঞ চৈতন্য" হইতে এক অংশ "অল্পজ্ঞ" ত্যাগ করিয়া অপর অংশ "চৈতন্য" গ্রহণ করা হইল বলিয়া জহদজহৎস্বার্থা হইল; আবার "চৈতন্য" অর্থ গ্রহণ করাতে মুখ্যার্থের সহিতও উভয়-শব্দের সম্বন্ধ থাকাতে লক্ষণাও হইল। সুতরাং তত্ত্বমসি-বাক্যের জীব-ব্রহ্মের অভেদবাচক অর্থ করিতে হইলে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণারই আশ্রয় লইতে হয়।

গৌণীবৃত্তি—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হইলে মুখ্যার্থের কোনও একটী গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে গৌণার্থ এবং যে বৃত্তিদ্বারা এই অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে গৌণীবৃত্তি। "গৌণী চাভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে—সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীব।" যেমন, "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ—এই দেবদত্ত একটী সিংহ।" সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থে অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষকে বুঝায়। দেবদত্ত একজন মানুষ; তাহার চারিটী পদ নাই, লেজ নাই, রোম নাই, সিংহের ন্যায় কেশর নাই; সুতরাং "দেবদত্ত একটী সিংহ"-বাক্যে "দেবদত্ত সিংহের ন্যায় একটী পশু" এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থ এস্থলে গ্রহণ করা যায় না। তাহার—সিংহ-শব্দের—মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া সিংহের বিক্রমশালিত্ব গুণটীকে গ্রহণ করিয়া সিংহ-শব্দের অর্থ করা হয়—সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী। "এই দেবদত্ত সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী"—ইহাই হইবে "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের অর্থ। বিক্রমশালিত্বাংশে সিংহের সঙ্গে দেবদত্তের সাদৃশ্য। মুখ্যার্থের একটী গুণকে লইয়া এই অর্থ করা হইল বলিয়া ইহাকে গৌণীবৃত্তিমূলক অর্থ বলা হইল।

কোনও কোনও বৈয়াকরণ গৌণীবৃত্তিকে পৃথক্ একটা বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, গৌণী-বৃত্তিও এক রকম লক্ষণা। তাঁহাদের মতে লক্ষণা দুইরকমের—গৌণী ও শুদ্ধা। যে অর্থে মুখ্যার্থের গুণের সাদৃশ্য মাত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাই গৌণী-লক্ষণালব্ধ অর্থ; গুণসাদৃশ্য ব্যতীত অন্য রকমের লক্ষণালব্ধ অর্থকে শুদ্ধালক্ষণালব্ধ অর্থ বলা হয়। সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি। সাদৃশ্যাৎ তু মতা গৌণ্যঃ। সাহিত্য-দর্পণ॥" উপরে "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের অর্থপ্রসঙ্গে সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থ "বিক্রমশালী পশুবিশেষ" হইতে "পশুবিশেষ" অংশত্যাগ করিয়া "বিক্রমশালী" অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং এই অর্থকে জহদজহল্লক্ষণালব্ধ অর্থ বলিয়াও মনে করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লক্ষণা-বৃত্তিতে বা গৌণী-বৃত্তিতে অর্থ করিতে হইলে যুক্তি ও কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মুখ্যাবৃত্তিতে যুক্তি বা কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না।

সাধারণতঃ, যে স্থলে মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করিলে শব্দের বা বাক্যের অর্থসঙ্গতি হয় না, সেই স্থলেই লক্ষণাবৃত্তিতে বা গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিতে হয়। মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে। রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা-শক্তিরর্পিতা॥ সাহিত্যদর্পণ॥ যে গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকে, গ্রন্থকারের মর্য্যাদারক্ষার্থ ভ্রম-প্রমাদাদিকে প্রচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যানেও হয়তো লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু বেদান্ত-সূত্রে এসকল দোষ নাই বলিয়া লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে তাহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। যে স্থলে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই, যে স্থলে মুখ্যবৃত্তিতেই প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, সেই

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা। | গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থলে কষ্টকল্পনার সাহায্যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে মুখ্য অর্থ—বাক্যের প্রকৃত অর্থই—প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাঁহাতে তিনি মুখ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতেই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন; তাহাতে সূত্রের মুখ্যার্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার কল্পিত অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য শুনিলে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ জানা যায় না বলিয়া কোনও উপকার তো হয়ই না, কল্পিত অপব্যাখ্যা শুনায় বরং যথেষ্ট অপকারই হইয়া থাকে।

ভাষ্য—"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥" যে গ্রন্থে মূলসূত্রের অনুকূল পদসমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাষ্য বলে। **আচার্য্য**—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য; ইনি বেদান্ত-সূত্রের একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; ইহা জ্ঞানমার্গের ভাষ্য; ইহাকে মায়াবাদী-ভাষ্য বা অদ্বৈতবাদী ভাষ্যও বলে। **নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য**—শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-ভাষ্য শুনিলে শ্রবণাদি-সমস্ত-ভক্তি-কার্য্যই পণ্ড হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন; জীব ও ব্রহ্মে অভেদ হইলে ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবকত্ব থাকে না; অথচ এই সেব্য-সেবকত্বভাবই ভক্তিমার্গের প্রাণ। তাই শাঙ্কর-ভাষ্য ভক্তি-বিরোধী।

প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য চর্চ্চা করিতেন; তাঁহাদের নিকটে বেদান্ত শ্রবণ করিতে হইলে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই শ্রবণ করিতে হয়; কিন্তু এই ভাষ্য ভক্তি-বিরোধী বলিয়াই যে প্রভু তাহা শ্রবণ করেন না, তাহাই তিনি জানাইলেন। এই স্থলে "বেদান্ত না শুন কেন" ইত্যাদি ৯৬ পয়ারের উত্তর দেওয়া হইল।

১০৫। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তো সাক্ষাৎ মহাদেব-"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"। পদ্মপুরাণ-উত্তর-খণ্ডেও জানিতে পারা যায় যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—"দেবি! কলিকালে ব্রাহ্মণ (শঙ্করাচার্য্য)-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমিই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥'' ২৫।৭॥" আবার শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়, মহাদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।১২।১৩।১৬॥" বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবতার শঙ্করাচার্য্য কেন ভক্তি-বিরোধী ভাষ্য রচনা করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—**"তাঁহার নাহিক দোষ"** ইত্যাদি। ঈশ্বরাদেশেই তিনি সূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করিয়া গৌণার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহার—শঙ্করাচার্য্যের। **ঈশ্বরাজ্ঞা**—সমস্ত লোকই যদি ভগবদুন্মুখ হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি কার্য্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে; তাই সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ মহাদেবকে আদেশ করিলেন—স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥—স্বকল্পিত আগম-শাস্ত্র দ্বারা তুমি জনসমূহকে মদবিমুখ কর; আমাকেও গোপন কর; যেন সৃষ্টি-কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড॥ ৬২।৩১॥" এই ঈশ্বরাদেশ-বশতঃই শঙ্করাচার্য্যরূপে মহাদেব মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বকে গোপন করিয়াছেন।

[ঈশ্বরাদেশ-সম্বন্ধে একটী কথা আপনা-আপনিই মনে উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ ৩।২।৫॥" ভগবান্ পরম-করুণ; তাই সংসার-তাপদগ্ধ জীবকুলের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা তিনি ব্যাকুল; লোক-নিস্তারের নিমিত্ত ব্যাকুলতা তাঁহার স্বভাবগত—স্বরূপগত বিশেষত্ব; যেহেতু তিনি পরম-করুণ। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ জীবকুলকে নিজের দিকে উন্মুখ করিবার নিমিত্ত তিনি যত ব্যাকুল, ভগবদুন্মুখতার নিমিত্ত জীব বোধ হয় তত ব্যাকুল নহে; পরম-করুণ ভগবানের এই ব্যাকুলতার প্রমাণ সর্ব্বদাই পাওয়া যাইতেছে। মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে আপনা-আপনি কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইতে পারে না বলিয়া কৃপা করিয়া তিনি বেদ-

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে—ভগবান্। | চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন—শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া যদি জীব ভগবদুন্মুখ হয়, এই আশায়। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদ-পুরাণ ॥ ২।২০।১০৭।" অপ্রকট-লীলা-কালে এই ভাবেই শ্রীভগবানের লোক-নিস্তারের স্বাভাবিকী বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল হইতেছে না দেখিলে যুগাবতারাদি নানাবিধ অবতাররূপে জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি জীবকুলকে ভগবদুন্মুখ করিতে চেষ্টা করেন। আবার ব্রহ্মার এক দিনে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া এমন সব পরম-লোভনীয়-লীলা বিস্তার করেন—যাহা দেখিয়া বা যাহার কথা শুনিয়া লোক সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিতে পারে এবং ভগবদুন্মুখতার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে; কেবল ইহাই নহে—সেই পরম-লোভনীয় লীলারসের আস্বাদন করিবার যোগ্যতা যাহাতে জীব লাভ করিতে পারে—তদ্বিষয়ক উপদেশও দান করেন এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজে ভজন করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠা, এত চেষ্টা যাঁহার—তিনি কেন জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার জন্য মহাদেবকে আদেশ করিবেন? যেই ভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়। তথাপি না জানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ কোটিকাম-ধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥ ২।১৫।১৭৭-৭৮॥" সেই পরম-করুণ ভগবান্ যে উত্তরোত্তর সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অসচ্ছাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বহির্ম্মুখ লোকদিগের অন্তর্ম্মুখী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত মহাদেবকে আদেশ করিবেন, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইহা তাঁহার স্বরূপগত করুণাময়ত্বের বিরোধী বলিয়া তাঁহার আদেশ বলিয়াই মনে হয় না। এসমস্ত কারণে, কোনও কোনও সমালোচক হয়তো "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ" ইত্যাদি এবং "মায়াবাদম-সচ্ছাস্ত্রমিত্যাদি" শ্লোক সমূহকে শঙ্কর-ভাষ্যবিরোধী ব্যক্তিগণের কৃত প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু প্রক্ষেপ না বলিয়া এই বিরোধের একরূপ সমাধানও অসম্ভব নহে। জীবকর্ত্তৃক নিজেকে পাওয়াইবার নিমিত্ত পরমকরুণ ভগবান্ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও তিনি সহজে কাহারও নিকটে ধরা দেন না—কারণ, তাঁহাকে পাওয়ার যোগ্যতা না জন্মিলে তিনি ধরা দিলেও জীব তাঁহাকে রাখিতে পারিবে না; তাই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া ॥ (প্রেমভক্তিই তাঁহাকে রাখার একমাত্র উপায়)॥ ১।৮।১৬॥" যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা চিত্তে বিরাজিত থাকে, সে পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না॥ ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি সাধকের সাক্ষাতে অনেক সময় লোভনীয় ভোগ্য-বস্তুও উপস্থিত করেন এবং তাঁহাকে পাওয়ার নিমিত্ত সাধকের চিত্তে কতটুকু উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক সময় নিজেকেও লুক্কায়িত করিয়া রাখেন। যিনি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বাস্তবিকই উৎকণ্ঠিত, ভোগের বস্তু তাঁহার লোভ জন্মাইতে পারে না, লুক্কায়িত ভগবান্‌কেও তিনি ভক্তিবলে বাহির করিতে পারেন; তিনি পরীক্ষায় জয়ী হয়েন; ভগবান্ তাঁহার নিকটে ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যাহা হউক, সম্ভবতঃ ভক্তকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ শ্রীভগবান্ তাঁহাকে গোপন করিবার নিমিত্ত ভক্তিবিরোধী-শাস্ত্র-প্রচার করিতে মহাদেবকে আদেশ করিয়াছেন।]

১০৬। মুখ্যবৃত্তিতে বেদান্ত-সূত্রের অর্থ করিতে গেলে যে, অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি হয় না, সুতরাং লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিবার যে কোনও প্রয়োজনই নাই, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু কয়েকটি প্রধান কথার মুখ্যার্থ করিয়া দেখাইতেছেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শঙ্করাচার্য্যের অর্থও খণ্ডন করিতেছেন, ১০৬-১৩৯ পয়ারে। ১০৬ পয়ারে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

ব্রহ্ম—বৃন্হ + মন্ (কর্ত্তৃবাচ্যে); বৃন্হ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে মন্-প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃন্হ-ধাতুর অর্থ বৃহত্ত্ব। তাহা হইলে ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্যার্থ হইল—বৃংহতি, বৃংহয়তিচ, ইতি ব্রহ্ম।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃংহতি—যিনি বড় হয়েন, তিনি ব্রহ্ম এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। যিনি অপরকে বড় করেন, বড় করার শক্তি অবশ্যই তাঁহার আছে; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতেই ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়া জানা যায়। বাস্তবিক, শ্রুতিও এই অর্থের সমর্থন করেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের অনেক পরাশক্তি আছে এবং এই সকল শক্তি তাঁহার স্বাভাবিকী (অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য) এবং নিত্যসংযুক্ত; (অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায় আগন্তুক নহে) এবং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াও (অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও) আছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেতাশ্বতর ।৬।৮॥" শ্রুতির এই উক্তিই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শক্তি হইল ব্রহ্মের বিশেষণ। শক্তি অর্থ—কার্য্যক্ষমতা; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে; বস্তুতঃ কার্য্যদ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয়। যদি কেহ বলেন—শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই—এরূপও তো হইতে পারে? শ্রুতির "জ্ঞানবলক্রিয়া চ"-শব্দেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়; এস্থলে পরিষ্কার-ভাবেই শ্রুতি বলিতেছেন—তাঁহার ক্রিয়াও আছে। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি যে ক্রিয়শীলা—শ্রুতির বাক্য হইতে তাহাও পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্ম-শব্দের অর্থের দুইটী অংশ পাওয়া গেল—বৃংহতি (যিনি নিজে বড় হয়েন) এবং বৃংহয়তি (যিনি অপরকেও বড় করেন)। এই দুইটী অংশই গ্রহণীয় কিনা? বস্তুতঃ দুইটী অংশই গ্রহণীয়। একটী অংশ বাদ দিলে অর্থ-সঙ্কোচ হইবে; ব্রহ্মবস্তুতে অর্থ-সঙ্কোচের স্থান নাই। শব্দের অর্থ-নির্ণয়-ব্যাপারে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি নামে একটা বৃত্তি আছে; ধাতুর, প্রকৃতির এবং প্রত্যয়ের ব্যাপকতম অর্থ গ্রহণ করিলেই মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির অর্থ পাওয়া যায়। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির প্রকৃষ্ট স্থান হইতেছে ব্রহ্মবস্তুতে—যাহাতে কোনও রূপ সঙ্কোচের অবকাশ নাই। যাহা হউক, এসকল হইল যুক্তির কথা। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থের উক্ত দুইটী অংশই যে গ্রহণীয়, শাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ আছে। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ বি, পু, ১।১২।৫৭॥" শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"ন তৎ-সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। ৬।৮॥—তাঁহার সমানও দেখা যায় না, তাঁহা অপেক্ষা বড়ও দেখা যায় না।" এই উক্তিদ্বারা "বৃংহতি"—অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্ব্বোদ্ধৃত "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচ।"—বাক্য হইতে "বৃংহয়তি"—অংশগ্রহণের কথা জানা যায়।

যাহা হউক, ব্রহ্ম বড়—সর্ব্ববিষয়ে বড়। বড়-শব্দের (বৃংহ-ধাতুর) ব্যাপকতম-অর্থ ধরিলে বুঝা যায়, ব্রহ্ম সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তিনি বৃহত্তম তত্ত্ব, তিনি অনন্ত, অসীম। শ্রুতিও বলেন—"অনন্তং ব্রহ্ম।" শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেন—"ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। ২।২৪।৫৩॥" ব্রহ্মের এই আনন্ত্য সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে। স্বরূপে (অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে) তিনি "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"—সর্ব্বব্যাপক। শক্তিবিষয়ে বৃহত্তমতার তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও অনন্ত এবং প্রত্যেক শক্তির কার্য্য, কার্য্যবৈচিত্রী এবং প্রকাশ-বৈচিত্রীও অনন্ত। ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে অসমোর্দ্ধ, কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা-অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥"

এইরূপই যে ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বা মুখ্য অর্থ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-শব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতো রর্থানুগমাৎ সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। ব্রঃ সূ, ১।১।১ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।" এস্থলে আচার্য্যপাদ স্বীকার করিতেছেন—বৃংহ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগতঅর্থে জানা যায় যে, ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্ম-পুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মুণ্ডক। ২।৭॥" ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকারের দ্বারাই তাঁহার সবিশেষত্ব এবং ভগবত্তা স্বীকৃত হইতেছে। যদ্দ্বারা কোনও বস্তুর পরিচয় দেওয়া যায়; তাহাই সেই বস্তুর বিশেষণ এবং তাহাই সেই বস্তুকে বিশেষত্ব দান করে। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থই যখন বৃহত্তম, তখন সহজেই বুঝা যায়, এই বৃহত্তমতা ব্রহ্মের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একটী বিশেষণ—গুণ; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দটীই সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সত্যং শিবম্ সুন্দরম্" বলা হইয়াছে, "রসো বৈ সঃ" বলা হইয়াছে, "আনন্দম্ ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" বলা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্ববিৎ, সত্যং, শিবম্, আনন্দম্, সুন্দরম্, রসঃ—ইহাদের প্রত্যেকটী শব্দই বিশেষত্ব-বাচক; সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব শ্রুতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহার কোনও বিশেষত্ব নাই, কোনও শব্দদ্বারাই তাহার উল্লেখ করা যায় না; তাহা অশব্দ। ব্রহ্ম অশব্দ নহেন; অশব্দ হইলে শ্রুতিতে ব্রহ্মের কোনও উল্লেখ থাকাই সম্ভব হইত না। শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্ম সবিশেষ। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী বলিয়া, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া, তাঁহার সশক্তিকত্ব যেমন নিত্য, তাঁহার সবিশেষত্বও তেমনি নিত্য।

শক্তির ক্রিয়াশীলত্বের কথা এবং ব্রহ্মের ক্রিয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শক্তির অভিব্যক্তিই ক্রিয়া। ব্রহ্মের শক্তি যেমন নিত্য, অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিদ্যমান, তদ্রূপ শক্তির ক্রিয়াশীলত্বও তাঁহাতে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। শক্তি কেবল শক্তিমাত্ররূপেই বিদ্যমান নহে, অন্যবিধ অনন্ত বৈশিষ্ট্যরূপেও বর্ত্তমান; শক্তির এই সকল বৈশিষ্ট্য, শক্তিমান্ ব্রহ্মেরই বৈশিষ্ট্য। শক্তির ন্যায়, শক্তির বৈশিষ্ট্যও ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। শক্তির অনেক বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মের লীলাতে অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম যে লীলাময়, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—এই বেদান্ত-সূত্রেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। লীলা—অর্থ তো ক্রীড়া, খেলা। ব্রহ্ম লীলা করেন, খেলা করেন; সুতরাং লীলা করার ইচ্ছা এবং উপকরণও তাঁহার আছে। ব্রহ্ম যখন পূর্ণতম বস্তু, তখন কোনও অভাব-বোধ হইতে তাঁহার খেলার বাসনা নয়। তিনি যখন আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—আনন্দের উচ্ছ্বাসে, আনন্দের প্রেরণাতেই তাঁহার খেলা, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। "স ঐক্ষত", "স অকাময়ত", ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য হইতে তাঁহার ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার পরিচয়ও পাওয়া যায়; অবশ্য এ সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার প্রাকৃত নহে; কারণ, সৃষ্টির পরেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব; সৃষ্টির পূর্ব্বেই তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি তাঁহারই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত। এই সমস্ত নানাবিধ বৈশিষ্টাই তাঁহার স্বাভাবিকী-শক্তির বৈভব। শ্রুতি আরও বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ (গো, তা,)।" এই কৃষ্ণকেই পরম-ব্রহ্ম বলা হয়। "কৃষি র্ভূবাচকশব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" গোপালতাপনী-শ্রুতি এই পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥—যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ছায় শ্যামল, যাঁহার বস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মাল্যবেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।" এই শ্রুতিবাক্যে পরম-ব্রহ্মের রূপ এবং পরিচ্ছদাদি এবং বেশ-ভূষাদির পরিচয়ও পাওয়া গেল। এসমস্তও তাঁহার স্বাভাবিকী-শক্তিরই বৈভব। শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীই তাঁহার রূপ। শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই তিনি **ভগবান্**। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ংভবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ—এবিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, উর্দ্ধেও কেহ নাই। ইহাই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্ই অভিহিত হয়েন; ভগবত্ত্বায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭॥"—বাক্যও সেই পরম-ব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরই কথা বলিয়াছেন।

এস্থলে ব্রহ্মকে স্বয়ংভগবান্ বলা হইল; তাহাতে বুঝা যায়, ভগবান্ যেন অনেক আছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? শক্তির বিকাশেই ভগবত্ত্বা; শক্তিবিকাশের অনন্তবৈচিত্রী। এই অনন্তবৈচিত্রীর মধ্যে একটী বৈচিত্রীতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ এবং একটী বৈচিত্রীতে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এই দুইটী বৈচিত্রীর মধ্যবর্ত্তী

তাঁহার বিভূতি দেহ—সব চিদাকার। | চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে 'নিরাকার'॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে অনন্ত-বৈচিত্রী। শক্তি এবং শক্তিমান্—এই দুই অবিচ্ছেদ্য বস্তু লইয়াই ব্রহ্ম। সুতরাং যেস্থলে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ—ততটুকুমাত্র বিকাশ, কেবল সত্ত্বামাত্র রক্ষার জন্য যতটুকুর প্রয়োজন—তাহাতে ব্রহ্মত্বেরও ন্যূনতম বিকাশ বলিয়া মনে করা যায়; স্বরূপের তারতম্য কোনও সময়েই হইতে পারেনা, তাহা সকল সময়েই সর্ব্বব্যাপক থাকিবে; ব্রহ্মত্ব-বিকাশের তারতম্য দ্বারা শক্তিবিকাশের তারতম্যই মাত্র সূচিত হইতেছে। যে বৈচিত্রীতে ন্যূনতম বিকাশ, তাহাতে শক্তির বিকাশ কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। এস্থলে বৈশিষ্ট্য বলিতে রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যাদিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ কোনও বিশেষত্ব এই বৈচিত্রীতে নাই বলিয়া এই বৈচিত্রীকে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও বলা হয়; ইনি নির্গুণ, নিরাকার। ইঁহাকে ভগবান্‌ও বলা যায় না; কারণ, ইঁহাতে ঐশ্বর্য্যাদি—অর্থাৎ শক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাদি ইঁহাতে নাই। আর যে বৈচিত্রীতে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, তাঁহাতে ব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ। মধ্যবর্ত্তী বৈচিত্রীসমূহে শক্তির উল্লেখ-যোগ্য বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহারাও ভগবান্; কিন্তু শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে তাঁহাদের ভগবত্তারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মত্বের এবং ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ যে বৈচিত্রীতে, তিনি স্বয়ংভগবান; আর অন্যান্য ভগবদাখ্য বৈচিত্রীতে শক্তির বা ভগবত্তার আংশিক অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বয়ংভগবানের অংশ বলা যায়। সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই রূপগুণাদি আছে। এই যে অনন্ত বৈচিত্রী, একই মূল পরম-ব্রহ্ম বা স্বয়ংভগবানের মধ্যেই তৎসমস্ত বিদ্যমান্; তদতিরিক্ত কিছু নাই। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। গো, তা, শ্রুতি, পূ-২০॥" আবার এই সকল বহুরূপেও তিনি এক। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্। শ্রীভা, ১০।৪০।৭॥" (২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিশালী; তিনি স্বয়ংভগবান্। এই মুখ্যার্থ শ্রুতিদ্বারাও সমর্থিত। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। মাণ্ডুক্যশ্রুতি। এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি শ্রুতি হইতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মশব্দের অর্থ করা শাস্ত্রানুমোদিত হইবে না। ১।৭।১০৩-৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, **ব্রহ্ম**-শব্দের **মুখ্য অর্থে**—(স্বয়ং)-ভগবান্‌কেই বুঝায়। এই ভগবান্ **চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ**—চিচ্ছক্তির বিকাশ-বৈচিত্রীরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ; ষড়ৈশ্বর্য্যময়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে; এই চিচ্ছক্তির বিকারই ষড়ৈশ্বর্য্য; তাই ষড়ৈশ্বর্য্যকে চিদৈশ্বর্য্য বলা হইয়াছে। (১।২।১৫ পয়ারের টীকায় ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিচয় দ্রষ্টব্য।) **অনূর্দ্ধ সমান**—ন উর্দ্ধ-সমান = অনূর্দ্ধ সমান; অনূর্দ্ধ এবং অসমান; যাঁহার উর্দ্ধ বা যাঁহা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, তিনি অনূর্দ্ধ; আর যাঁহার সমানও কেহ নাই, তিনি অসমান। সর্ব্বাপেক্ষা বড়; আর-সকলে যাহা অপেক্ষা ছোট—অসমোর্দ্ধ। ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ৬।৮॥ তাই তিনিই পরতত্ত্ব।

১০৭। তাঁহার—ব্রহ্মের। **বিভূতি**—বৈভব; ঐশ্বর্য্য। ভগবানের ধাম, লীলাসামগ্রী প্রভৃতি। **দেহ**—বিগ্রহ; মূর্ত্তি। **চিদাকার**—চিন্ময়; অপ্রাকৃত; জড় বা প্রাকৃত নহে; চিদ্‌ঘন; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার দেহও সচ্চিদানন্দঘনবস্তু।

ভগবান্ লীলাময়; তাঁহার ধাম আছে, লীলা-পরিকর আছে, লীলার উপকরণাদি আছে; এসমস্ত তাঁহার বিভূতি; কিন্তু এসমস্তের একটীও প্রাকৃত জড় বস্তু নহে; প্রত্যেকটীই তাঁহার চিচ্ছক্তির বিকার, সুতরাং প্রত্যেকটীই অপ্রাকৃত চিন্ময়; তাঁহার দেহও চিদ্‌ঘনবস্তু—অপ্রাকৃত। এ সমস্তের কোনটীই সৃষ্ট বস্তু নহে—পরন্তু অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; ইহারা নিত্য বস্তু। ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব ও পরিকরতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বপয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ বিবৃত হইল। এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের কৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন।

পূর্ব্ব-পয়ারের টীকায় ব্রহ্ম-শব্দের অর্থে দুইটী অংশ ছিল—বৃংহতি এবং বৃংহয়তি; শঙ্করাচার্য্য "বৃংহয়তি"-অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল "বৃংহতি"-অংশেরই অর্থ করিয়াছেন; "বৃংহয়তি (যিনি বড় করিতে পারেন—এই)-অংশ হইতেই ব্রহ্মের শক্তির ও শক্তি-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়; এই অংশকে বাদ দিলে শক্তিও পাওয়া যায় না, কাজেই শক্তিকার্য্য পাওয়া যায় না—ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার বলিয়া অর্থ করিতে হয়; নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহার বিভূতি-আদিও থাকিতে পারে না; কারণ, বিভূতি হইল শক্তির বিকার। কেবলমাত্র বৃংহতি-অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্ম বিভু-বস্তু মাত্র; কিন্তু তাঁহার শক্তি, আকার, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, ধাম, পরিকরাদি কিছুই নাই,—তিনি নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র। ব্রহ্মের যে শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ যদি শ্রুতিতে কোনও স্থলে না থাকিত, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই শক্তি-সূচক বৃংহয়তি-অংশ ত্যাগ করিয়া অর্থ করিতে হইত—মুখ্যার্থ-ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হইত; নচেৎ অর্থের সঙ্গতি হইতনা। কিন্তু শক্তির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ (পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি) বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও—(সুতরাং মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করার হেতু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও) শঙ্করাচার্য্য সেই প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া গৌণ-বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অর্থ সঙ্গত হয় নাই। ইহাই প্রভুর উক্তির অভিপ্রায়।

[এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তুও স্বীকার করেন নাই। আবার অদ্বৈতবাদ-শাস্ত্রে অন্যত্র কিন্তু সর্ব্ববস্তু-নিয়ামিকা একটী ঐশ্বরী শক্তির উল্লেখও পাওয়া যায়। "শক্তি রস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তু-নিয়ামিকা। পঞ্চদশী ।৩।৩৮॥" এই ঐশ্বরী শক্তিকে তাঁহারা মায়া বলেন। এই মায়ায় স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—"মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে; ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, ইহা সনাতনী। ইহা ভাবরূপী কোনও একটা বস্তু, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধী ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ। বেদান্তসার।" যাহা হউক, এই যে মায়া—ইহা কাহার শক্তি? যদি বল ব্রহ্মের শক্তি, তাহা হইলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হইলেন কিরূপে? যদি বল ইহা সগুণ-ব্রহ্মের (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য) শক্তি, তাহাও হইতে পারেনা; কারণ, অদ্বৈতবাদীরা বলেন, মায়া-শক্তির উপাধি-সংযুক্ত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর; তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ। পঞ্চদশী ।৩।৪০।" তাঁহাদের মতে এই সগুণ-ব্রহ্মের পারমার্থিক-সত্তা নাই; মায়িক-উপাধি-বিযুক্ত হইলেই সগুণব্রহ্ম নির্গুণ হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, মায়া সগুণব্রহ্ম হইতে একটী পৃথক বস্তু—যাহা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করিলে তবে সগুণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। এই মায়াই আবার নির্গুণ ব্রহ্মকে কোষোপাধিযুক্ত করিলে কোষোপাধিযুক্ত ব্রহ্ম তখন জীব-নামে অভিহিত হয়। "কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্। পঞ্চদশী ।৩।৪১।" তাহা হইলে, এই মায়া জীব হইতেও একটী পৃথক বস্তু। অদ্বৈতবাদীদের মতে সগুণ-ব্রহ্মও অনিত্য, জীবও অনিত্য; কিন্তু সগুণ-ব্রহ্ম ও জীবের উৎপত্তির হেতুভূতা মায়া "সনাতনী"; সনাতনী মায়া—অসনাতন সগুণ-ব্রহ্ম বা জীবের শক্তি হইতে পারেনা। যদি বল ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র একটী বস্তু; তাহা হইলেও এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটী দ্বিতীয় বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। ইহাও অদ্বৈতবাদীর মতবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে—অদ্বৈতবাদীদের উক্তি যেন পরস্পর-বিরোধী; তাঁহারা ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়া প্রচার করিলেও, মায়াশক্তির স্বীকার দ্বারা ব্রহ্মের শক্তিই স্বীকার করিতেছেন। বিবর্ত্তবাদ (পরবর্ত্তী ১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)-প্রসঙ্গেও তাঁহারা বলেন, এই মায়াই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্রহ্মে ভগবদ্-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে; এই স্থলেও মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে।]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিদ্বিভূতি—চিন্ময় বিভূতি; চিচ্ছক্তির বিকাররূপা বিভূতি। **আচ্ছাদি**—গোপন করিয়া, উপেক্ষা করিয়া; ব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব-সূচক অর্থাংশ ত্যাগ করিয়া। **তাঁরে**—ব্রহ্মকে। **নিরাকার**—আকারহীন; অমূর্ত্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিরবয়ব। তিনি বলেন—যাহার অবয়ব আছে, তাহা অনিত্য। "সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি। ২।১।২৬ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য॥ ব্রহ্মের আকার আছে—ইহা স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মকে অনিত্য বলিয়া মনে করিতে হয়।" ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত যুক্তিমাত্র; এই যুক্তির অনুকূল কোনও শ্রুতিপ্রমাণও তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। অবশ্য ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥"—ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ গোঃ তাঃ শ্রুতিঃ॥ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদিকম্ অথর্ব্বশিরসি॥"—ইত্যাদি ব্রহ্মের সাকারত্বসূচক কোনও শ্রুতিপ্রমাণেরই উল্লেখ করেন নাই। উভয় প্রকারের শ্রুতির সমন্বয়-সাধক কোনও বিচারসহ প্রয়াসও তাঁহার দৃষ্ট হয় না। (এই পয়ারের টীকার পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লৌকিকযুক্তি। কিন্তু লৌকিক যুক্তি দ্বারা যে শ্রুতির উক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"—এই বেদান্ত-সূত্রে (২।১।২৭) স্বয়ং ব্যাসদেবই তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করিয়াও কেবল নিরবয়বত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যসম্বন্ধেই শ্রুতিবাক্যের নিরঙ্কুশ প্রামাণ্যত্ব তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন; অথচ ব্রহ্মসূত্রকার নিজে কোথাও বলেন নাই যে,—কেবল ব্রহ্মের নিরবয়বত্বসূচক-শ্রুতিসম্বন্ধেই "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—এই সূত্র বিহিত হইল, ব্রহ্মের সাবয়বত্ব-সূচক কোনও শ্রুতি-সম্বন্ধে এই সূত্র প্রযোজ্য হইবে না। বস্তুতঃ সমস্ত শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধেই সূত্রকারের এই স্পষ্ট আদেশ—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।

গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিরাকার; "রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্ ন রূপাদিমৎ—নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্। ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৪ ভাষ্য।"

কিন্তু এই ব্রহ্মসূত্রের (অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ।৩।২।১৪॥ সূত্রের) গোবিন্দ-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহমিত্যাদিকমথর্ব্বশিরসি শ্রূয়তে। তত্র ব্রহ্ম বিগ্রহবন্ন বেতি সংশয়ে সচ্চিদানন্দো রূপং যস্তেতি বহুব্রীহ্যাশ্রয়ণা-দ্বিষ্ণোর্মূর্ত্তিরিত্যাদিব্যপদেশাচ্চ বিগ্রহবত্তদিতি প্রাপ্তে—অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ॥—অথর্ব্বোপনিষদ হইতে জানা যায়,—কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপ, অক্লিষ্টকারী, সেই এক ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ ইত্যাদি। এই বাক্য হইতে জানা গেল যে, ব্রহ্মই কৃষ্ণ, ব্রহ্মই গোবিন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। প্রশ্ন হইতে পারে—সেই ব্রহ্ম কি বিগ্রহবান্, না কি বিগ্রহবান্ নহেন? সচ্চিদানন্দই রূপ যাঁহার তিনি সচ্চিদানন্দরূপ—এই বহুব্রীহি-সমাসলব্ধ অর্থে তাঁহার বিগ্রহ বা মূর্ত্তি আছে—সুতরাং তিনি বিগ্রহবান্—ইহাই বুঝা যায়। (যাঁহার ধন আছে, তিনি ধনবান্। সুতরাং ধনবান্-শব্দে দুইটা বস্তু সূচিত হইতেছে—ধন এবং ধনী। তদ্রূপ, এস্থলে বিগ্রহবান্-শব্দেও দুইটী বস্তু সূচিত হইতেছে—বিগ্রহ এবং যাঁহার বিগ্রহ আছে, সেই বিগ্রহবান্। যেমন দেহ এবং দেহী। দেহ এবং দেহী দুইটী বস্তু; তদ্রূপ, বিগ্রহ এবং বিগ্রহবান্ও দুই বস্তু। এই অর্থে ব্রহ্ম যদি বিগ্রহবান্ হয়েন, তাহা হইলে বিগ্রহ হয় তাঁহার দেহ এবং তিনি হয়েন দেহী। প্রশ্ন হইতেছে—ব্রহ্ম এইরূপ বিগ্রহবান্ বা রূপবান্ কিনা)। এই প্রশ্নের উত্তরেই পূর্ব্বোল্লিখিত বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়া গোবিন্দভাষ্যকার বলিতেছেন—"রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ। যুক্তিনিরাসার্থমেব শব্দঃ। কুতঃ তদিতি। তস্য রূপস্যৈব প্রধানত্বাদাত্মত্বাৎ। বিভুত্বজ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্ত্বাদিধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ।—ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট (বিগ্রহবান্) নহেন, তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ (অরূপবৎ—ন রূপবৎ, রূপবান্ বা বিগ্রহবান্ অর্থাৎ বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন; বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, যেই বিগ্রহ, সেই ব্রহ্ম এবং যেই ব্রহ্ম, সেই বিগ্রহ। এই দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে—একই বস্তু, একই তত্ত্ব)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বোল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিনিরসনার্থই সূত্রে এব-শব্দের প্রয়োগ। ব্রহ্মই বিগ্রহ, বিগ্রহই ব্রহ্ম—এরূপ সিদ্ধান্ত কেন করা হইল, তাহার কারণ রূপেই সূত্র বলিতেছেন—তৎ-প্রধানত্বাৎ। ঐ রূপ বা বিগ্রহই প্রাধন বা আত্মা; ব্রহ্মের বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি যেমন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তদ্রূপ বিগ্রহও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ব্রহ্মাত্মকই বিগ্রহ, অথবা বিগ্রহাত্মকই ব্রহ্ম। ভাষ্যকার এস্থলে জানাইলেন—ব্রহ্ম মূর্ত্ত; নিরাকার নহেন—সাকার। তবে তাঁহার এই মূর্ত্তি বা আকার তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই। ব্রহ্মে দেহই দেহী এবং দেহীই দেহ। দেহ-দেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি। ব্রহ্ম হইলেন চৈতন্যঘন, আনন্দঘন, রসঘন বস্তু। তাঁহাতে চৈতন্য বা আনন্দ বা রস (এই তিনটী শব্দের বাচ্যই এক অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব) ব্যতীত অপর কিছুই নাই—যেমন লবণপিণ্ডের সর্ব্বত্রই লবণ, কোথাও লবণব্যতীত অন্য কিছুই নাই। "স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এব এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ।৪।৫।১৩॥" প্রশ্ন হইতে পারে—সাধারণতঃ বলা হয় কেন, ব্রহ্মের রূপ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, আকার আছে, ইত্যাদি। এসমস্ত ভাষার ভঙ্গী মাত্র। একটী সোনার চাকা দেখিলে আমরা যেমন বলি—একটী সোনার তাল। টাকা দেখিলে বলি—রূপার টাকা। এস্থলে যেই তাল, সে-ই সোনা; যেই সোনা, সে-ই তাল। যেই টাকা, সে-ই রূপা; যেই রূপা, সে-ই টাকা। প্রকাশের ভঙ্গীতে বলা হয়—সোনার তাল, রূপার টাকা। ব্রহ্ম এবং তাঁহার বিগ্রহসম্বন্ধেও ঐরূপ।

পূর্ব্বপয়ারের টীকায় ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপের শ্রুতিপ্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলেও উপরে অথর্ব্বোপনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন—শ্রুতিতে যে-স্থলে সাকার ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে উপাসনার সুবিধার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে—"আকারবদ্ ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি * * * উপাসনাবিধি-প্রধানানি। ব্র, সূ, ৩।২।১৪ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য।" এবিষয়ে গোবিন্দভাষ্য বলেন—"ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে।—উপাসনায় ধ্যানের জন্য যে বিগ্রহ স্বীকার্য্য, তাহা অলীক কল্পনা নহে। তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ।—যে হেতু শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে; সুতরাং এই বিগ্রহ প্রমেয় তত্ত্ব, অলীক বস্তু নহে ।৩।২।১৬ সূত্র-ভাষ্য।" ইহার পরে ভাষ্যকার বহু শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অলীক বস্তুর উপাসনাও অলীক। ঈশ্বরের উপাসনা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ; শঙ্করাচার্য্য বলেন—ঈশ্বরও মায়া-বিজৃম্ভিত। তাহা হইলে ঈশ্বরও মায়িক উপাধিযুক্ত বস্তু। মায়ানিবৃত্তির জন্যই উপাসনা। মায়িক উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের উপাসনায় মায়ানিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারেনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—মায়া দুর্লঙ্ঘনীয়া, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যদি মায়িক উপাধিযুক্ত হয়েন, তিনি কিরূপে তাঁহার চরণে শরণাগত লোকদিগকে মায়ামুক্ত করিবেন? যিনি নিজে বন্ধনযুক্ত, তিনি অপরকে বন্ধনমুক্ত করিতে পারেন না। নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে—মুক্তগণও লীলায় (ভক্তি-কৃপায়) বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন। ভগবান্ বলিতেই বিগ্রহময় বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু আচার্য্যপাদের মতে ভগবান্ হইলেন মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। মায়ামুক্ত জীবগণ কেন মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের ভজন করিবেন? শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তিদ্বারাই তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ভগবান্ নিত্য মায়ামুক্ত; নচেৎ মায়ামুক্ত জীবগণ তাঁহার ভজন করিতেন না। মায়ামুক্ত জীবগণও যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন, তাহার শ্রুতি-প্রমাণও আছে। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতইতি। সৌপর্ণশ্রুতি। সুতরাং উপাসনার সুবিধার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা নহে। যে রূপের উপাসনা শ্রুতি-আদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই রূপ নিত্য, সত্য, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ? ॥ ১০৮

তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথাও বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক ? না তাহা অলীক নহে, তাহাও সত্য। সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য, নিত্য। পূর্ব্বপয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়া তাঁহাতে অনন্ত বৈচিত্রী নিত্য বর্ত্তমান্। যে বৈচিত্রীতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ, সেই বৈচিত্রীই নিরাকার, স্থতরাং এই নিরাকার বৈচিত্রীও সত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার বস্তু মাত্রই পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ ; ব্রহ্ম যদি সকার হয়েন, তবে কিরূপে বিভু হইতে পারেন ? ইহার উত্তর—বিভুত্ব ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম বলিয়া যে কোনও স্বরূপেই তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপক। ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০৮। **চিদানন্দ তেঁহো**—সেই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ভগবান্ চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; তাঁহার দেহে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই ; এসমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু ; তাঁহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তুই নাই এবং থাকিতেও পারে না ; কারণ, শ্রুতি বলেন—তিনি "আনন্দং ব্রহ্মং।" **তাঁর**—সেই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ভগবানের। **স্থান**—ধাম ; লীলাস্থান। **পরিবার**—লীলাপরিকর। কেবল তিনিই যে চিদানন্দময়, তাহা নহে ; তাঁহার ধাম, লীলা-পরিকর এবং লীলার উপকরণাদি সমস্তই চিদানন্দময়—সমস্তই অপ্রাকৃত-বস্তুর সংস্পর্শশূন্য। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই সাকার ভগবানকে বলিয়াছেন **প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার**—প্রকৃতি বা মায়ার একটী গুণ যে সত্ত্ব, সেই সত্ত্ব-গুণের বিকার।

সৃষ্টির সময়েই মায়ার গুণ-সমূহ বিক্ষুব্ধ হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; এবং বিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতির গুণাদি হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; ভগবানের দেহ যদি প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকারই হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে—তিনিও সৃষ্ট বস্তু, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না, মহাপ্রলয়ে যখন সৃষ্ট-বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তখন ভগবান্‌ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি অনিত্য ; কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবাক্য-বিরোধী ; শ্রুতি বলেন, তিনি "নিত্যো নিত্যানাম্। —কাঠ ২।২।১৩ ॥"

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা-ইত্যাদি। শ্বেতা।৩।১৯।" "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি। মাণ্ডুক্য।৬।" "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু রিত্যাদি। ছান্দো।৮।১।৫" ইত্যাদি শ্রুতি যে সগুণ-ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীরা সেই মহেশ্বরকে মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র বলেন ; স্থতরাং তাঁহাদের মতে মহেশ্বরের পারমার্থিক সত্ত্বা থাকে না। "মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ। যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং ত্বদ্বৈতমেবহি ॥—মায়ারূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়েই মায়িক অবস্তু। তদ্দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব। পঞ্চদশী।৬।২৩৬।" এইরূপে শ্রুতি-প্রোক্ত মহেশ্বরকে অদ্বৈতবাদীরা যে মায়িক-বস্তু বলিলেন, তাহাও ব্রহ্ম-শব্দের গৌণার্থ করার ফলেই ; স্থতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত—শ্রুতি-প্রোক্ত মহেশ্বর যে মায়িক-বস্তু মাত্র, এই মত—গ্রহণ করা যাইতে থারে না। অদ্বৈত-বাদীদের এইরূপ উক্তির অনুকূল কোনও শ্রুতি-প্রমাণও দৃষ্ট হয় না।

১০৯। **তাঁর দোষ নাহি**—ব্রহ্ম-বস্তুর নিরাকার অর্থ করায় এবং সাকার-স্বরূপকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলায় শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ দোষ নাই। যেহেতু **তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস**—তিনি আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যমাত্র ; ভগবানের আদেশেই তিনি এরূপ অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু **আর যেই শুনে** ইত্যাদি—এইরূপ অর্থ যে ব্যক্তি শুনে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। (সর্ব্বনাশের কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য)।

বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥ ১১০

ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১০। **অন্বয়**—বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত করিয়া মানে, ইহার উপর বিষ্ণু-নিন্দা আর নাই।

বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপক ভগবান্। **কলেবর**—দেহ। **বিষ্ণুকলেবরকে**—সর্ব্বব্যাপক ভগবানের দেহকে। **প্রাকৃত**—প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার। **মানে**—মনে করে। **ইহার উপর**—ইহা অপেক্ষা অধিক।

অপ্রাকৃত নিত্য বস্তু চিদানন্দঘন ভগবদ্-বিগ্রহকে অনিত্য প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করা আপক্ষা অধিকতর বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না। কোনও বস্তুকে হেয়রূপে বর্ণনা করাই তাহার নিন্দা; যে বস্তু যত বড়, তাহাকে তত হেয়রূপে বর্ণনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা। পরব্রহ্ম ভগবান্ হইলেন বৃহত্তম বস্তু; তিনি সমস্ত নিত্য বস্তুরও নিত্যবস্তু—অনাদি, অনন্ত। আর প্রাকৃত-বস্তু হইল অনিত্য, ধ্বংসশীল। ভগবানের তুলনায় প্রাকৃত-সত্ত্বাদি মায়িক গুণ এত হেয় যে, তাঁহার সান্নিধ্যে যাওয়ার অধিকার তো দূরের কথা, তাঁহার ধামের এক কোণে যাওয়ার অধিকারও তাহাদের নাই—এমন কি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিবার অধিকারও প্রকৃতির নাই। এতাদৃশী প্রকৃতির গুণের বিকার বলিয়া সেই ভগবানকে বর্ণনা করিলে তাঁহার নিন্দা চরমসীমাই প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণু-নিন্দা শ্রবণ করিলে সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া মহা নরকে পতিত হইতে হয়। "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো না পৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ শ্রীভাঃ ১০।৭৪।৪০॥ তত্র তোষণী—অধো মহানরকং সুকৃতক্ষয়েণ তস্য কদাপি সদ্গতির্নস্যাদিতি সূচিতম্॥ ভগবানের এবং ভগবদ্দাসের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সে স্থান হইতে চলিয়া না যায়, তাহার সমস্ত সুকৃতি নষ্ট হয় এবং তাহার মহানরকে বাস হয়, কখনও সদ্গতি হয় না।" এজন্যই পূর্ব্বপয়ারে বলা হইয়াছে—"যে শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।" ১০৬-১১০ পয়ারে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থালোচনা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক; তাঁহার ঐশ্বর্য্য নাই, ধাম নাই, লীলা নাই, লীলাপরিকরাদি নাই। প্রভুর মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, সশক্তিক; তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, লীলা আছে, ধাম আছে, লীলা-পরিকরাদি আছে।

১১১। ব্রহ্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া জীব-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, ১১১-১১৩ পয়ারে। জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ কি, তাহাই আলোচিত হইতেছে। জ্বলদগ্নিরাশি এবং স্ফুলিঙ্গের কণায় যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ—ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

জ্বলিত—প্রজ্বলিত। **জ্বলন**—অগ্নি। ঈশ্বরতত্ত্ব প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় বৃহৎ; আর তাহার তুলনায় জীবের স্বরূপ—**স্ফুলিঙ্গের কণ**—কণার মত; ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তুল্য—অতিক্ষুদ্র। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের উপমার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ যেমন স্বরূপতঃ একই বস্তু (উভয়েই অগ্নি), তদ্রূপ ঈশ্বর এবং জীবও স্বরূপতঃ একই বস্তু (চৈতন্য); ঈশ্বর বিভু-চৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। "পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। বেদান্তসূত্র।২।৩।১৮ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" "এষোঽণুরাত্মা। মুণ্ডক ৩।১।৯॥" শ্রুতিতে যে যে স্থলে "আত্মাকে মহৎ বা বিভু" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। বেদান্তসূত্র।২।৩।২০ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য। চৈতন্যাংশে উভয়েই এক—অভেদ। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ যেমন জ্বলদগ্নিরাশি নহে, হইতেও পারে না; তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবও বিভু-চৈতন্য ঈশ্বর নহে, হইতেও পারেনা; অণুত্ব ও বিভুত্ব হিসাবে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে; ঈশ্বর বিভু-বস্তু—অতি বৃহৎ; কিন্তু জীব অণু-বস্তু—অতি ক্ষুদ্র; কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শত ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ সমগ্র কেশের তুলনায় যত ক্ষুদ্র হয়, ঈশ্বরের তুলনায় জীব তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এইরূপে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ এবং অভেদ দুই বর্ত্তমান; উভয়েই চিদ্বস্তু বলিয়া

জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১১২

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং (৭।৫)—
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ। অস্যা উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে। চক্রবর্ত্তী ॥ ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাদের মধ্যে অভেদ, কিন্তু অণুত্ব ও বিভুত্ব হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ। "পরমাত্মনোঽন্যো জীবঃ—জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। বেদান্তসূত্র। ২।৩।১৮ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" ভেদের অন্য হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১১২। জীবতত্ত্ব হইল ঈশ্বরের শক্তি—জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি ; আর ঈশ্বর হইলেন এই জীবশক্তির অধিকারী বা নিয়ন্তা শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। এই দু'য়ের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান। ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সময় সময় কস্তুরীর অনুভবব্যতীতও তাহার গন্ধের অনুভব হয়—অর্থাৎ শক্তিমানের অনুভব ব্যতীত শক্তির অনুভব হয় ; তাহাতে শক্তি-শক্তিমানে ভেদ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। একই বস্তুতে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিলেও শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ প্রতীত হয় ; কিন্তু কস্তুরী হইতে পৃথকভাবে যেমন কস্তুরীর গন্ধের কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অনুপ্রবেশ করে বলিয়া শক্তিমান্ হইতে পৃথক ভাবে শক্তিরও ধারণা করা যায়না ; এই হিসাবে শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। তাই জীবে এবং ঈশ্বরেও ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। "তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ।—পরমাত্মসন্দর্ভঃ।৩৭।" এ সমস্ত কারণে জীবকে ঈশ্বরের ভেদাভেদ-প্রকাশ বলা হয়। "কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। ২।২০।১০১॥" ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১।২।৮৬। এবং ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইথে—এই বিষয়ে ; জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তদ্বিষয়ে। **পরমাণ**—প্রমাণ। জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, গীতা ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উক্তির সমর্থনার্থ নিম্নে গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। মহাবাহো (হে মহাবাহু অর্জ্জুন)! ইয়ং (এই প্রকৃতি) অপরা (অনুৎকৃষ্টা) ; ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যাং (ভিন্ন) জীবভূতাং (জীবশক্তিরূপা) মে (আমার) পরাং (উৎকৃষ্টা) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) বিদ্ধি (জান) ; যয়া (যদ্দারা—যে উৎকৃষ্টা প্রকৃতি দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত হইয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে মহাবাহো! ইহা (পূর্ব্ব-শ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা) নিকৃষ্টা প্রকৃতি ; ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তিরূপা আমার আর একটা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি জানিবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।" ৬।

ইয়ং—এই প্রকৃতি। আলোচ্য-শ্লোকের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী "ভূমিরাপোঽনলো বায়ু রিত্যাদি" (গীতা।৭।৪।)-শ্লোকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী বহিরঙ্গা-শক্তিভূতা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। এস্থলে ইয়ং-শব্দে সেই বহিরঙ্গা-শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। **অপরা**—ন পরা (শ্রেষ্ঠা) অপরা ; যাহা শ্রেষ্ঠা নহে ; নিকৃষ্টা ; সেই বহিরঙ্গা-প্রকৃতি জড় ; তাই তাহাকে নিকৃষ্টা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ভিন্ন (অন্যা) যে প্রকৃতি, তাহা **জীবভূতা**—জীবশক্তিরূপা ; তটস্থা-শক্তিরূপা ; এই শক্তি হইতেই জগতের সমস্ত জীব

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অবিদ্যা কর্ম্ম কার্যং যস্যাঃ সা, তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থমস্তীতি। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীব ॥৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিঃসৃত হইয়াছে; এজন্য ইহাকে "জীবভূতা" বলা হইয়াছে; এই জীবভূতা প্রকৃতিই **পরা**—উৎকৃষ্টা; ইহা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি বলিয়া ইহাকে উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে। ক্ষিত্যপ-তেজ-আদি যে প্রকৃতির বিকার, তাহা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি, তাহা জড়, তাই তাহা নিকৃষ্টা; কিন্তু জীবসমূহ যে শক্তির অংশ, তাহা ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাহা জড় নহে —পরন্তু চৈতন্যময়ী শক্তি; তাই তাহা জড়-বহিরঙ্গাশক্তি হইতে উৎকৃষ্টা। **যয়েদং** ইত্যাদি—এই চৈতন্যময়ী জীব-শক্তি (স্বীয় ভোগের নিমিত্ত) এই জগৎকে ধারণ (গ্রহণ) করিয়া রহিয়াছে। এই জগতে জীবের যত কিছু ভোগ্যবস্তু (শয্যাসনাদি) আছে, তৎসমস্তই নিকৃষ্টা জড়া বহিরঙ্গা প্রকৃতির বিকার; তৎসমস্ত (অথবা সেই জড়া প্রকৃতি) হইল ভোগ্য, আর জীব হইল তাহার ভোক্তা; জীব চেতনাময় বলিয়াই অচেতন জড়-জগৎকে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ভোগ করিতে পারে। জীব হইল জীবশক্তির অংশ; এই জীবশক্তিভূত জীব যে বহিরঙ্গাশক্তি-ভূত জগৎকে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ভোগের জন্য গ্রহণ করিয়াছে—তাহাই হইল জীবশক্তিকর্ত্তৃক জগতের ধারণ; এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "যয়েদং ধার্য্যতে" ইত্যাদি।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ যে এই শক্তির শক্তিমান্—তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল।

শ্লো।৭। অন্বয়। বিষ্ণুশক্তিঃ (বিষ্ণুশক্তি) পরা (পরাশক্তি নামে) প্রোক্তা (কথিতা হয়); অপরা (অপর শক্তি) ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি নামে কথিত হয়); অন্যা তৃতীয়া (অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি) অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞা (অবিদ্যা-কর্ম্ম-নামে) ইষ্যতে (অভিহিত হয়)।

অনুবাদ। বিষ্ণুশক্তি পরা নামে অভিহিতা, অপর একটী শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি; অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞায় অভিহিতা।৭।

ভগবানের শক্তিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ **বিষ্ণুশক্তি**—এস্থলে স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিকেই বিষ্ণুশক্তি বলা হইয়াছে; কারণ, ইহাকে **পরা**—শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে; অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই শক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, **ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা**—ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী শক্তি; ইহার অপর নাম জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। তৃতীয়তঃ, **অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা**—মায়াশক্তি। "ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভেদ-হেতুভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যা সা তথাচ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরেকীকৃত্যোক্তিঃ সংসারলক্ষণকার্য্যৈক্যাৎ।" অবিদ্যা হইল ব্যাপক, কর্ম্ম হইল তাহার ব্যাপ্য; এস্থলে, ব্যাপ্য ও ব্যাপককে—হেতু ও হেতুমান্‌কে একীভূত করিয়া বলা হইয়াছে। অবিদ্যা এবং কর্ম্ম সংজ্ঞা যাহার—মায়া। অবিদ্যা অর্থ মায়া—ইহা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি; সংসারও মায়ার কার্য্য—কার্য্য-কারণের অভেদ মনে করিলে, তাহাও মায়া—বহিরঙ্গা-শক্তি; সুতরাং কারণরূপা অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যরূপ সংসার—এই উভয়েই ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া; ইহাই তৃতীয়া শক্তি। ইহা বহিরঙ্গা-শক্তি হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবকে আবৃত করিতে পারে।

জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, এই শ্লোকেও তাহা প্রদর্শিত হইল। ১।২।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব। | আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরমহত্ত্ব॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৩। বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থে জীবতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন।

মুখ্যার্থানুসারে প্রভু বলেন—জীব অণুচৈতন্য, ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য; জীব ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম তাহার শক্তিমান; কেবল চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; আর সমস্ত বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে—এই ভেদ নিত্য; মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও জীবের পৃথক্ সত্ত্বা থাকিবে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের দাস।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—জীব ও ব্রহ্মে অভেদ, কোনও ভেদ নাই; বুদ্ধি-আদি উপাধির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্রহ্মই জীব; জ্ঞানবলে এই উপাধি নষ্ট হইয়া গেলেই জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যাইবে। "অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে সদেব তূপাধিসম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যতে ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্। বেদান্তসূত্র। ৩।২।৯ সূত্রের শঙ্করভাষ্য। যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধস্তাবদেবাস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ, পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেণাস্তি। ব্রহ্মসূত্র। ২।৩।৩০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।" **হেন জীবতত্ত্ব**—কৃষ্ণশক্তির অংশ অণুচৈতন্যজীব। **লিখি পরতত্ত্ব**—পরতত্ত্ব-ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা। **আচ্ছন্ন করিল**—আবৃত করিল; ঢাকিয়া রাখিল। **শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব**—ঈশ্বরের বিভুত্ব, যাহা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিলে বিভুচৈতন্য ঈশ্বরেরই মহিমা খর্ব্ব করা হয় ঈশ্বরের মহিমা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত; তাই শঙ্করাচার্য্যের কথায় ঈশ্বর ও জীবে অভিন্ন মনে করিয়া সাধারণ জীবের ধারণা হইবে যে, ঈশ্বরের শক্তি-সামর্থ্যাদি জীবেরই শক্তি-সামর্থ্যের তুল্য; তাহাতে সাধারণ লোকের নিকটে ঈশ্বরের মহিমা আচ্ছন্ন হইয়াই থাকিবে, খর্ব্ব হইয়াই থাকিবে। মহাসমুদ্রকে সূচ্যগ্রস্থিত জলকণারূপে পরিচিত করিলে সমুদ্রের মহিমাকেই খর্ব্ব করা হয়। বড়কে ক্ষুদ্রের সমান বলিলে বড়র-ই মহিমা-হানি হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের মহিমা খর্ব্ব করা হইয়াছে, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়।

নৃসিংহতাপনীর (২।৫।১৬১) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজে লিখিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। মুক্তব্যক্তিরাও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।" জীব ও ব্রহ্মে যদি কোনও ভেদই না থাকে, মুক্ত জীব যদি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূতই হইয়া যায়, তাহা হইলে—মুক্তাবস্থায় কোনওরূপ উপাধি না থাকায়—মুক্তজীবের পক্ষে স্বতন্ত্রদেহ ধারণ সম্ভবই হইতে পারে না। তথাপি শঙ্করাচার্য্যই যখন লিখিয়াছেন, মুক্তাবস্থায়ও জীব স্বতন্ত্রদেহ ধারণ করিতে পারে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের নিত্য-স্বতন্ত্র সত্ত্বা তিনিও স্বীকার করেন।

বেদান্তের জীবতত্ত্ববিষয়ক কয়েকটী সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও জীবস্বরূপের অণুত্ব-স্বীকার করিয়াছেন। উৎক্রান্তিগত্যগতীনাম্। ২।৩।১৯ সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—অণুরাত্মেতি গম্যতে জীবাত্মা অণু—ইহাই প্রমাণিত হইল। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ। ২।৩।২০-সূত্রের ভাষ্যেও অনুরূপ সিদ্ধান্তই তিনি করিয়াছেন—তস্মাদপি অস্য অণুত্বসিদ্ধিঃ—ইহা হইতেও জীবাত্মার অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে। ইহার পরের সূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবই এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষটী এই। যদি কেহ বলেন, আত্মা অণু নহে; কেননা শ্রুতিতে আত্মাকে মহান্ বলা হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন—নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ। ২।৩।২১॥ সূত্রের পদগুলিকে ভাঙ্গিয়া লিখিলে এইরূপ হইবে। ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ নহেন) অতৎশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ নাই, অন্যরূপ উল্লেখ আছে। আত্মা বৃহৎ—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়)। ইতি চেৎ (ইহা যদি কেহ বলেন) ন (না), ইতরাধিকারাৎ (যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে অন্য আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই)। শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতিপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপসংহারে লিখিয়াছেন—তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তর-শ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে।—পরিমাণান্তরশ্রবণ প্রাজ্ঞ (ব্রহ্ম)-বিষয়ক বলিয়া জীবের অণুত্ব স্বীকার্য্য। তাহার পরবর্ত্তী সূত্রে—স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ। ২।৩।২২। সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন "এষোঽণুরাত্মা"—ইত্যাদি শ্রুতিতে সাক্ষাদ্ভাবেই জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥"—এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও (৫।৯) তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর একটী পূর্ব্বপক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি আত্মা অণু হন, তাহা হইলে তিনি দেহের একাংশেই থাকেন; এবং একাংশে থাকিলে সমগ্র দেহে বেদনাদির জ্ঞান হয় কিরূপে? গ্রীষ্মকালেই বা সমস্ত দেহে তাপ অনুভূত হয় কেন? উত্তরে, অন্যান্য ভাষ্যকারদের ন্যায়, তিনিও বলিয়াছেন—পরবর্ত্তী সূত্রেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সূত্রটী হইতেছে এই। অবিরোধশ্চন্দনবৎ। ২।৩।২৩॥ আত্মার অণুত্ব এবং সমগ্রদেহে বেদনাদির অনুভব—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। চন্দনবৎ—যেমন একবিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে থাকিলে সমগ্র দেহেই তাহার স্নিগ্ধতা ব্যাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেবই এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন। অবস্থিতি-বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদিহি॥ ২।৩।২৪॥ অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা আমরা দেখি; সর্ব্বদেহে তাহার স্নিগ্ধতার ব্যাপ্তিও আমরা অনুভব করি। বেদনাদি সমগ্র দেহেই (স্নিগ্ধতার ন্যায়) অনুভূত হয়; কিন্তু আত্মা যে চন্দনবিন্দুর ন্যায় দেহের একস্থানে আছে, তাহা আমরা দেখিনা। আত্মা যদি অণু হন, একস্থানেই থাকিবে, সমগ্র দেহে থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মার অণুত্ব অনুমানমাত্র। ইতি চেৎ—এইরূপ যদি কেহ বলেন (ইহাই পূর্ব্বপক্ষ), উত্তরে বলা যায়, ন (না) অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি—আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইহা শ্রুতিতে আছে। "হৃদি হি এষ আত্মা। প্রশ্নোপনিষৎ॥ স বা এষ আত্মা হৃদি। ছান্দোগ্য। ৮।৩।৩॥" এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ-শঙ্করাচার্য্য উপসংহারে বলিয়াছেন। তস্মাৎ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরবৈষম্যাদ্ যুক্তমেবৈতদবিরোধশ্চন্দনবৎ।—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের বৈষম্য নাই বলিয়া চন্দনের দৃষ্টান্তে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। যাহা হউক, উক্ত সূত্রের পরবর্ত্তী—গুণাৎ বালোকবৎ (২।৩।২৫), ব্যতিরেকো গন্ধবৎ (২।৩।২৬), তথা চ দর্শয়তি (২।৩।২৭) এবং পৃথগুপদেশাৎ (২।৩।২৮) এই চারিটী—সূত্রেও শ্রীপাদ শঙ্কর উক্তরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী—তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২।৩।২৯)—সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত সূত্রসমূহে জীবের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সে সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের কথা। বস্তুতঃ জীব অণু নহে; জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহাই পরিমাণ। ব্রহ্ম অনন্ত; সুতরাং জীবও অনন্ত—অণু নহে। ইত্যাদি। সূত্রের তু-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। ন এতদ্ অস্তি অণুঃ আত্মা ইতি।—তু-শব্দে পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ বলেন—আত্মা অণু; বস্তুতঃ তাহা নহে।" শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ এই (২।৩।২৯) সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনার্থক বলেন নাই এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলিকেও বিরুদ্ধবাদী-পূর্ব্বপক্ষের উক্তিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ, এই কয়টী সূত্রের মুখ্য বিচার্য্য বিষয়ই হইতেছে—জীবাত্মার পরিমাণ। ২।৩।১৯ এবং ২।৩।২০ সূত্রে বলা হইল জীবাত্মা অণু-পরিমিত। পরবর্ত্তী ২।৩।২১ হইতে ২।৩।২৮ পর্য্যন্ত আটটী সূত্রে নানাবিধ শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক জীবের অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষের (অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন, আত্মা অণু নহে, বৃহৎ—বিভু, তাঁহাদের) মতের উল্লেখপূর্ব্বকও শ্রুতিপ্রমাণাদিদ্বারা তৎসমুদয়ের খণ্ডন করা হইয়াছে। জীবের অণুত্ব যদি সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেতই না হইবে, তাহা হইলে তিনি এতগুলি সূত্রদ্বারা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিতই বা করিলেন কেন? যদি জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনই তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি তদনুকূল সূত্রের উল্লেখ করিতেন এবং তাহার পরে বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষের (অর্থাৎ যাঁহারা জীবের বিভুত্ব স্বীকার করেন না, অণুত্বই স্বীকার করেন, তাঁহাদের) মতের অবতারণা করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেন। ইহাই হইত স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু শ্রীপাদশঙ্কর বলেন—এস্থলে সূত্রকার আগেই পূর্ব্বপক্ষের মত (জীব অণু—এই মত) উল্লেখ করিয়া তাহাকে নানা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার পরে ২।৩।২৯ সূত্রে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ২।৩।২৯ সূত্রের যেরূপ ভাষ্য বা অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন, তাহাই যদি একমাত্র অবিসংবাদিত অর্থ হইত, তাহা হইলেও তাঁহার অভিমত একেবারে উপেক্ষণীয় হইতে পারিতনা। কিন্তু তাঁহার অর্থ ই একমাত্র অর্থ নহে। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অর্থদ্বারা ইহাও বুঝা যায়, যে, সূত্রকার ব্যাসদেব জীবাত্মার পরিমাণ নির্ণয়ব্যাপারে বিরুদ্ধপক্ষের মতের আলোচনায় স্বাভাবিক পন্থারই অবলম্বন করিয়াছেন—প্রথমে নিজের প্রমেয় তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া তারপরে বিরুদ্ধ-বাদীদের মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে মনে করিতে হয়—ব্যাসদেব একটা অস্বাভাবিক পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক এবং বিরুদ্ধবাদীদের মত-খণ্ডনাত্মক যে সমস্ত সূত্রের উল্লেখ ব্যাসদেব করিয়াছেন, তৎসমস্ত অতি সহজ এবং পরিষ্কার; তাহাদের কোনওটীরই একাধিক অর্থ হইতে পারে না; তাই সে সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকেও অণুত্ব-প্রতিপাদক অর্থ ই করিতে হইয়াছে। মনে হয়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যবশতঃই শ্রীপাদ জীবের অণুত্ব স্বীকার করিতে পারিতেছেন না।

তাই উক্ত ২।৩।২৯ সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে জীব অণুপরিমিত হইতে পারেনা কেন, তাহার হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—"উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ। পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্। পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবস্তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণঃ বিভুত্বমাম্নাতং তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।—জীবের উৎপত্তির কথা জানা যায় না বলিয়া, পরব্রহ্মেরই প্রবেশের কথা শুনা যায় বলিয়া, জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায় বলিয়া পরব্রহ্মই জীব। ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহাই হইবে। পরব্রহ্ম বিভু; সুতরাং জীবও বিভু।" জীবের বিভুত্ব-সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেই যুক্তির অন্যরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। যথা—যাঁহারা জীবের অণুত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও শুদ্ধজীবের জন্মাদি বা উৎপত্তি স্বীকার করেন না; শুদ্ধজীব অনাদি। সুতরাং জীবের উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়াই যে জীব অণুপরিমিত হইতে পারেনা, এই যুক্তি বিচারসহ নহে। ব্রহ্মের প্রবেশের কথা—শুদ্ধজীবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের দেহের উৎপত্তি আছে—সৃষ্টিসময়ে; কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সেই দেহে জীবাত্মা প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মও পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন। শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় ধরিয়া লইতেছেন যে, সৃষ্ট দেহে প্রবিষ্ট ব্রহ্মই জীবাত্মা; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে জীবদেহে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে পরমাত্মারূপী ব্রহ্ম আছেন—এই শ্রুতিবাক্যের এবং দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও সার্থকতা থাকিত না। তারপর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে—চিদংশে শুদ্ধজীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া তাদাত্ম্যপ্রসঙ্গও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি কেবল মাত্র যে তাঁহার মতেরই পোষণ করে, তাহাই নয়। তাই ব্রহ্মের ন্যায় জীবও বিভু—এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ হইতে পারেনা। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে গেলে, এষঃ অণুঃ আত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যকে উপেক্ষা করিতে হয়। তিনি বলেন—শ্রুতিতে জীবাত্মার ঔপচারিক অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে, পারমার্থিক অণুত্বের কথা বলা হয় নাই; কিন্তু তাঁহার এই উক্তির অনুকূল কোনও শ্রুতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই। কেবল মাত্র লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয়েই তিনি জীবের অণুত্ববাচক শ্রুতিবাক্য-গুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তত্ত্বমসি-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তিনি ধরিয়া লইয়াছেন,—জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতো-ভাবে অভিন্ন, কিন্তু তাঁহার এইরূপ অর্থ যে বিচারসহ, তাহাও বলা যায় না। তাহার হেতু এই।

যে সকল শ্রুতিবাক্যের উপরে শ্রীপাদ শঙ্করের জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল এই কয়টী:—তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি শ্রীপাদ শঙ্করের মতের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য বিধান করে সত্য,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু অন্যমতাবলম্বীদের মতেরও প্রাতিকূল্য করে না। তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির লক্ষণাবৃত্তির অর্থ ই শঙ্কর-মতের পোষক।

একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই শ্রুতির মর্ম্ম হইতেছে এই যে—ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তু কোথায়ও নাই। অন্যমতাবলম্বীরাও একথাই বলেন। জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, ব্রহ্ম যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হয়, জীব যদি ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ই হইলেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্য দুইটী শঙ্করাচার্য্যের মতের এবং অন্য মতাবলম্বীদের মতেরও পোষক। সুতরাং ইহাদের দ্বারা কেবল শাঙ্কর-মতই প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্য মত নিরসিত হইল—একথা বলা চলে না।

তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—এই কয়টী শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায়, ব্রহ্মই জীব। জীব যদি ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মই জীব হয়েন—জলদগ্নিরাশির স্ফুলিঙ্গও যেমন অগ্নি, তদ্রূপ। স্ফুলিঙ্গ কিন্তু জলদগ্নিরাশি নহে। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যগুলিদ্বারাও কেবল মাত্র শঙ্করের মতই প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যমতও প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও যুক্তি আছে। উক্ত শ্রুতিগুলি হইতে জানা গেল—জীব ব্রহ্মই। কিন্তু কেবল ইহাদ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। জীব ব্রহ্মই, একথার সঙ্গে সঙ্গে যদি জানা যায় যে ব্রহ্ম জীবই—স্ফুলিঙ্গও জলদগ্নিরাশিই—তাহা হইলেও বরং জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব স্বীকার করা সম্ভব হইত। কিন্তু ব্রহ্ম জীবই—এইরূপ মর্ম্মাত্মক কোনও শ্রুতিবাক্যও শ্রীপাদ শঙ্কর উদ্ধৃত করেন নাই। এইরূপ কোনও শ্রুতিবাক্য নাইও।

শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, তেমনি অভেদবাচক বাক্যও আছে। এমন কি, একই শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয়। যেমন—ছান্দোগ্য উপনিষদে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। হে শ্বেতকেতো! তাহাই তুমি (অর্থাৎ ব্রহ্মই তুমি)। ৬।৮।৭॥ ইহা অভেদবাচক বাক্য। আবার ভেদবাচক বাক্যও ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ সকলই ব্রহ্ম; (যেহেতু) তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। ৩।১৪।১॥ এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা বলিলেই উপাস্য এবং উপাসক—এই দুইকে বুঝায়। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের-ভেদের কথাই পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম হই। ইহা বৃহদারণ্যকের অভেদবাচক বাক্য। য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি—স ইদং সর্ব্বং ভবতি।—যিনি জানেন, আমি ব্রহ্ম, তিনি সব হন। বৃ, আ ২।৪।১০॥ আবার ভেদবাচক শ্রুতিও আছে। স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—যেরূপ উর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। ২।১।২০॥ এই শ্রুতিও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না। একই শ্রুতিতেই যখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে,—একথা যেমন বলা চলে না; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার কোনওটীই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারেনা। তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকিতনা।

ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয় প্রকার বাক্যেই জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথাই—তত্ত্বের কথাই—বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় প্রকার বাক্যেরই সমান গুরুত্ব দিতে হইবে এবং সমান গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিক আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র সঙ্কলিত করিয়াছেন; তাই বেদান্তসূত্রের অপর এক নাম উত্তর-মীমাংসা। শ্রীপাদ শঙ্কর ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। 'ব্যাসভ্রান্ত' বলি তাহাঁ উঠাইল বিবাদ ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই উক্তির অনুকূলে তিনি কোনও শ্রুতিপ্রমাণও দেখান নাই। একজন যদি নিজের যুক্তির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া ভেদবাচক শ্রুতিগুলিকে ব্যবহারিক বলেন, তাহা হইলে অপর একজন আবার ঠিক সেইরূপেই কেবলমাত্র নিজের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকেও ব্যবহারিক বা অপারমার্থিক বলিতে পারেন। তাহাতে কোনওরূপ মীমাংসায় পৌছান যায় না। এই ব্যপারে শ্রীপাদ শঙ্কর স্থলবিশেষে যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল শ্রুতিবাক্য অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার মতের পোষণ করেনা; তাঁহার যুক্তির অনুকুল যে ব্যাখ্যা তিনি ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যে আরোপ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাইমাত্র তাঁহার অনুকূলে যায়; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাতে শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রকাশিত হয় না; মুখ্যার্থ অন্যরূপ এবং সমগ্র শ্রুতির সহিত সেই মুখ্যার্থের অসঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক, এই উভয়রূপ শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ের একটী মাত্র পন্থা আছে; তাহা হইতেছে—উভয়কে তুল্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা করেন নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহা করিয়াছেন—তিনি বলেন, জীব এবং ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাই প্রভু বলিয়াছেন, জীব হইল—"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ (৩।২।২৭), প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ (৩।২।২৮), অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথাচাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে (২।৩।৪৩)" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন—ব্রহ্ম চিৎ, বিভু চিৎ; আর, জীবও চিৎ, কিন্তু অণু-চিৎ। উভয়েই স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু বলিয়া চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই—জলদগ্নিরাশিতে এবং তাহার স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নি-হিসাবে কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ। "ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জলিত জলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১।৭।১১১॥" শ্রীপাদ শঙ্করও একথা স্বীকার করিয়াছেন—চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাহগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। ২।৩।৪৩ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। যাহা হউক, এইরূপ অভেদের কথা বলিয়া প্রভু ভেদের কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান; জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান, ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। এই অংশে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের চিন্মাত্রতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা পরিত্যাগ করিয়া এবং জীবেরও চিন্মাত্রতা গ্রহণ করিয়া তাহার অল্পজ্ঞতা-অল্পশক্তিমত্ত্বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণাবৃত্তির অর্থ গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

যাহাহউক, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে জীবকেই ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব বলা হইল। অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলাতে ব্রহ্মেরই মহিমা খর্ব্ব করা হইল।

১১৪। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন। ১১৪-১২ পয়ারে।

মুখ্যার্থে প্রভু বলেন—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম; ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন।

গৌণার্থে শঙ্করাচার্য্য বলেন—জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে; রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রম মাত্র।

ব্যাসের সূত্রেতে—ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের অন্তর্গত "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥"-এই সূত্রে।

পরিণামবাদ—"এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি; ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণতি, তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্মের পরিণতি।" এইরূপ মতকে পরিণামবাদ বলে। পরিণাম-সম্বন্ধে শ্রীজীব বলেন—"তত্ত্বতোহন্যথা ভাবঃ পরিণামঃ ইতি এব লক্ষণং ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৩ পৃঃ।—তত্ত্ব হইতে অন্যরূপ ভাবই পরিণাম, তত্ত্বের অন্যরূপ ভাব নহে। মূল বস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্য রূপ ধারণ করে, তবে সেই অন্যরূপকে তাহার পরিণাম বলে। মণিমন্ত্রমহৌষধি-আদির এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি দৃষ্ট হয়। তর্কের দ্বারা এইরূপ অচিন্ত্যশক্তির সমাধান পাওয়া যায় না।"

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। ১।৪।২৬"—এই বেদান্ত-সূত্রের মুখ্যার্থে—ব্রহ্মই যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন—তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥—এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন,—শ্রুতি হইতে জানা যায়, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—তিনিই স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্ট করিয়াছেন। কর্ত্তাও ব্রহ্ম, কর্ম্মও ব্রহ্ম। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ব্রহ্ম হইলেন পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদি, সৎস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান এবং কর্ত্তা; তিনি কিরূপে আবার কর্ম্ম হইতে পারেন? কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম্? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—পরিণামাৎ ইতি ব্রূমঃ পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়াস আত্মানমিতি। ব্রহ্ম পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ-স্বরূপ হইলেও বিশেষ বিকারীরূপে আপনাকে পরিণামিত করিয়াছেন।" উপসংহারেও শ্রীপাদ আচার্য্য বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনায়ং পরিণামঃ—ব্রহ্মের বিকারাত্মতাবশতঃই এই পরিণাম।" এই জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম, এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে এই পরিণতিদ্বারা যে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন।

এই সূত্রে ব্যাসদেব যে পরিণামবাদই স্থাপন করিয়াছেন, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনিও প্রশ্ন করিয়াছেন—"ননু কথম্ একস্য এব পূর্ব্বসিদ্ধস্য কর্ত্তৃতয়া স্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বম্?" উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"তত্রাহ। পরিণামাৎ ইতি। কূটস্থত্বাদ্যবিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাদবিরুদ্ধং তস্য তৎ।—কূটস্থত্বাদির অবিরোধী পরিণামবিশেষ তাঁহাতে সম্ভব বলিয়াই কর্ত্তা হইয়াও তিনি কর্ম্ম হইতে পারেন।" তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম পরাশক্তি আছে, ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি আছে এবং মায়াশক্তি আছে। ইহাদ্বারা তাঁহার নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব জানা যাইতেছে। তস্য নিমিত্তত্বমুপাদনত্বং চ অভিধীয়তে। পরাশক্তিমানরূপে তিনি নিমিত্ত এবং অপর শক্তিদ্বয় দ্বারা তিনি উপাদান। তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ। দ্বিতীয়ন্তু তদন্যশক্তিদ্বয়-দ্বারৈব।" তিনি আরও বলেন—"এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থম্ উপাদানম্ তু পরিণামীতি সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্তৃ স্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্ম। ইত্যেকস্যৈব তত্তচ্চ সিদ্ধম্। এইরূপে, নিমিত্ত হইল কূটস্থ (নির্ব্বিকার) এবং উপাদান হইল পরিণামী—সূক্ষ্মপ্রকৃতিক হইলেন কর্ত্তা, আর স্থূলপ্রকৃতিক হইলেন কর্ম্ম। ইহাতে এক ব্রহ্মেরই নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, সূক্ষ্ম-প্রকৃতিকত্ব ও স্থূলপ্রকৃতিকত্ব সিদ্ধ হইল।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ উভয়েই পরিণামবাদ স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, পরিণামে ব্রহ্ম বিকারী হয়েন, আর শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ বলেন—পরিণামে ব্রহ্ম বিকারী হয়েন না,—কূটস্থত্বাদ্যবিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাৎ—তাঁহার পরিণাম হইল তাঁহার কূটস্থত্বের (নির্ব্বিকারত্বের) অবিরোধী, পরিণামী হইয়াও তিনি নির্ব্বিকার; তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম বশতঃই ইহা সম্ভব।

এসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"তস্মান্নির্ব্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনঃ অচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসবলোহচালনাদিবৎ। ৭২॥—পরমাত্মার অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃই পরিণামাদি সত্ত্বেও তিনি নির্ব্বিকার থাকেন, যেহেতু নির্ব্বিকারত্ব তাঁহার স্বভাব। চিন্তামণি যেমন তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বার্থ প্রসব করে এবং চুম্বক যেমন তাহার স্বভাববশতঃ লৌহকে চালিত করে—তদ্রূপ।" শ্রুতি যে ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি॥" বেদান্তের "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি॥ ২।১।২৪॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মের অচিন্ত্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারাই যে ব্রহ্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও বলিয়াছেন। "তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদবিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।"

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ-সূত্রে ব্রহ্মের পরিণামিত্ব বেদান্তই স্বীকার করিলেন। আবার ব্রহ্ম যে কূটস্থ-নির্ব্বিকার, ইহাও শ্রুতিরই কথা। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ।" "অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্ত্তৃনির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেব। তথাহি বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতি মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি শ্রীগোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদি। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব ইতি মাণ্ডুব্যোপনিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপ্যমিতত্বঞ্চ। দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা স বিশ্বকৃদ্বিশ্বকৃদ্বিদাত্ময়ে। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ। সর্ব্বকৃতত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যানুসারেণৈব চ স্বীকার্য্যং নতু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি।—২।১।২৭ বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।"—এস্থলে উদ্ধৃত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য এইরূপ—"ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানস্বরূপ; মূর্ত্ত ও জ্ঞানবান্; একেই বহু; অংশশূন্য এবং অংশবিশিষ্ট; অমিত এবং মিত; সর্ব্বকর্ত্তা এবং নির্ব্বিকার; বৃহৎ, দিব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; আসীন হইলেও বহু স্থানে গমন করেন; শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট; অদ্বিতীয়-স্বরূপ, স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্মদাতা; বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা।" শ্রুতির এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়। আমাদের বিচারবুদ্ধিদ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধধর্ম্মত্বের কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় না। একই বস্তু কিরূপে অংশহীন হইয়াও অংশবিশিষ্ট হইতে পারে, একেই বহু হইতে পারে, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে, পরিণামী হইয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারে,—কোনও লৌকিক যুক্তিদ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু না গেলেও, এসমস্তকে মিথ্যা বলা যায় না; যেহেতু এসমস্ত শ্রুতির উক্তি, অপৌরুষের। তাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। বেদান্তসূত্র। ২।১।২৭॥ ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২।১।২৮॥"—এই বেদান্ত-সূত্রে ব্যাসদেব স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়াছেন।

ব্রহ্মের জগৎ-রূপে পরিণতি-সম্বন্ধে গোবিন্দভাষ্যের উক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—পরাশক্তিমান্‌রূপে ব্রহ্ম সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এবং জীবশক্তি ও মায়াশক্তিদ্বারা তিনি উপাদান এবং উপাদানরূপেই তিনি পরিণামী। এসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে নতু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ॥ ৭৩॥—ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেই তিনি পরিণামপ্রাপ্ত হন, স্বরূপে নহে।" শ্রীমদ্ভাগবতের—"প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহম্॥ ১১।২৪।১৯॥"—এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বঞ্চ শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশো মায়া উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তির্নিমিত্তম্। তদ্ব্যূহময়ীতূপাদানমিতি বিবেকঃ।"—শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদানাংশ প্রধানকেই তিনি স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তি বলিয়াছেন এবং এই উপাদানাংশ প্রধানরূপেই ঈশ্বর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অস্য সতঃ কার্য্যস্যোপাদানং যা প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধা যশ্চাস্য আধারঃ কেষাঞ্চিন্মতে অধিষ্ঠানকারণং পুরুষঃ যশ্চ গুণক্ষোভেনাভিব্যঞ্জকঃ কালো নিমিত্তং তত্ত্রিতয়ং ব্রহ্মরূপোঽহমেব প্রকৃতেঃ শক্তিত্বাৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষস্য মদংশত্বাৎ কালস্য মচ্চেষ্টারূপত্বাৎ তত্ত্রিতয়মহমেব। এবঞ্চ প্রকৃতের্জগদুপাদানত্বাদেব মম জগদুপাদানত্বম্। কিঞ্চ। তস্যা বিকারিত্বেঽপি ন মে বিকারিত্বং তস্যা মচ্ছক্তিত্বেঽপি মৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিত্বমেব মৎস্বরূপস্য মায়াতীতত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ।—কেহ প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে অধিষ্ঠান-কারণ বলেন, এবং যে কাল গুণক্ষোভদ্বারা অভিব্যঞ্জক হয়, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলেন। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)—প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনই ব্রহ্মরূপ আমি; কেননা, প্রকৃতি আমার শক্তি, পুরুষ আমার অংশ এবং কাল আমার চেষ্টা; সুতরাং এই তিনই—বস্তুতঃ আমি। এইরূপে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়াই আমি জগতের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকারপ্রাপ্ত হইনা; যেহেতু, প্রকৃতি আমার শক্তি হইলেও আমার স্বরূপশক্তি নহে—আমার বহিরঙ্গা শক্তি মাত্র; আমি মায়াতীত বলিয়া, আমার বহিরঙ্গা-শক্তির বিকারে আমি বিকার-প্রাপ্ত হইনা।" শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে একথাই বলিয়াছেন—স্বরূপে তিনি পরিণাম-প্রাপ্ত হয়েন না (অর্থাৎ স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না), উপাদানরূপ বহিরঙ্গা-শক্তিরূপেই তিনি পরিণতি-প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার শক্তিতে প্রকৃতিই জগদ্রূপে পরিণত হয়, তিনি স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্যও একথাই বলিয়াছেন—"নিমিত্তং কূটস্থম্ উপাদানম্ তু পরিণামীতি।"

ব্যাসভ্রান্ত—আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬॥ এই সূত্রে বেদান্তসূত্রকারই যে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও যে পরিণামবাদমূলক অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী—"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ।২।১।১৪॥"-সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়োঽর্থা লোকে সমাধিগতা ইতি।—প্রশ্ন হইতে পারে, মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তে পরিণামী ব্রহ্মই (অর্থাৎ পরিণাম-বাদই) শাস্ত্রের অভিপ্রেত; যেহেতু, লোকে দেখা যায়—মৃত্তিকাদি সমস্ত পদার্থই পরিণামী।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ন ইত্যুচ্যতে। স বা এষ মহান্ অজঃ, আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম স এষ নেতি নেতি আত্মা অস্থূলম্ অনণু ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধ-শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হি একস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্ স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ। নহি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি।—না, (ব্রহ্ম পরিণামী, সুতরাং পরিণামবাদই শাস্ত্রসম্মত) একথা ঠিক নহে। যেহেতু, সেই আত্মা মহান্, অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম; তিনি ইহাও নহেন, উহাও নহেন; স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন—ইত্যাদি সর্ব্ববিধবিক্রিয়া-প্রতিষেধক শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের কূটস্থত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। একই ব্রহ্মের পরিণামিত্ব এবং অপরিণামিত্ব—এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—একই কূটস্থ ব্রহ্মেরই স্থিতি-গতি-প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মের কথা শুনা যায়। উত্তরে বলা যায়—না, হইতে পারে না; "কূটস্থ"—এই বিশেষণই ব্রহ্মের অনেক-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের বিরোধী। কূটস্থ ব্রহ্মের স্থিতি-গতি-আদি অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।" পরিণামবাদ যে ঠিক নহে,—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহাই এস্থলে বলিলেন। ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন ব্যাসদেব। সেই পরিণামবাদ ঠিক নহে, শাস্ত্রসম্মত নহে, বলাতে সূত্রকার-ব্যাসদেবকেই প্রকারান্তরে ভ্রান্ত বলা হইল। ইহাই "ব্যাস-ভ্রান্ত বলি তাহাঁ উঠাইল বিবাদ।"—বাক্যের তাৎপর্য্য। **তাহাঁ**—তাহাতে; পরিণামবাদ-বিষয়ে। **বিবাদ**—আপত্তি।

পরিণাম-বাদ ঠিক নহে, একথা বলিতে যাইয়া উপরে-উদ্ধৃত ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই—পরিণাম-বাদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম কূটস্থ; যিনি কূটস্থ, তিনি কখনও বিকারী হইতে পারেন না; তিনি নিত্য অবিকারী। স্থিতিশীল ব্রহ্মেরও যে গতি আছে, তিনি যে মিত এবং অমিত উভয়ই, তিনি যে নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়—ইত্যাদি-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ থাকাসত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—"কূটস্থ-ব্রহ্ম অনেক-ধর্ম্মাশ্রয় হইতে পারেন না"। এস্থলে

"পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।" | এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি শ্রুতিবাক্যকেও উপেক্ষা করিলেন—কেবল স্বীয় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া। তাঁহার যুক্তিও হইল এই যে—কূটস্থ-বিশেষণ হইতেই ব্রহ্মের অনেক-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব নিরসিত হইয়া থাকে। অথচ, ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃ তিনি যে নানাবিধ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়, তাহা শ্রুতিও যে স্বীকার করেন, পূর্ব্বেই তাহা দেখান হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, ২।১।২৪-বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও বলিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

১১৫। পরিণামবাদমূলক অর্থকে শঙ্করাচার্য্য কেন ভ্রান্ত বলিয়াছেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। **পরিণামবাদ** ইত্যাদি—পরিণাম অর্থ বিকার; দুগ্ধের পরিণাম দধি অর্থাৎ দুগ্ধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া (রূপান্তরিত বা নষ্ট হইয়া) দধি হয়; তদ্রূপ জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম বা বিকার হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী (বিকার প্রাপ্ত বা রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্য) হইয়া পড়েন; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী—নিত্য শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু; পরিণামবাদ স্বীকার করিলে তাঁহার অবিকারিত্ব (বা অপরিবর্ত্তনীয়তা) থাকেনা; কাজেই পরিণামবাদকে ভ্রান্ত মত বলিতে হইবে। ইহা শঙ্করাচার্য্যের-যুক্তি। পূর্ব্বপয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

এত কহি—পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এইরূপ বলিয়া। **বিবর্ত্তবাদ**—ভ্রমবাদ। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়; শুক্তিতে (ঝিনুকে) যেমন রজত (রৌপ্য)-ভ্রম হয়; মরুভূমি মধ্যে মরীচিতে (সূর্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম হয়; তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হইতেছে; এই যে বিবিধ বৈচিত্রীময় বিশাল জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের ইহা ভ্রম-মাত্র—ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলিয়া ভ্রম করিতেছি। প্রত্যক্ষাদি বিষয়ীভূত জগৎ অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে অধ্যাস (ভ্রমাত্মক প্রত্যয়) মাত্র। "অস্মৎপ্রত্যয়গোচরে-ঽবিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ অধ্যাসঃ। অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তৎবুদ্ধিরিতি অবোচাম।—অধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ।—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপ্রারম্ভে শঙ্করাচার্য্য।" রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও আমরা ভীত হই; শুক্তিতে রজত-ভ্রমেও আমরা প্রলুব্ধ হই; মরুভূমির মধ্যস্থলে মরীচিতে মরীচিকা-ভ্রমে জলপ্রাপ্তির আশায় আমরা আশ্বস্ত হই; তথাপি কিন্তু এ সমস্ত ভ্রান্তিই—ভ্রান্তিব্যতীত অপর কিছুই নহে; তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমাদের প্রত্যক্ষ সুখ, দুঃখ ও ভরসার অনেক বস্তু আছে বলিয়া আমরা মনে করিলেও আমাদের এই প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র, ভ্রান্তিব্যতীত অপর কিছুই নহে। যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর জ্ঞান জন্মিলে এই ভ্রম দূরীভূত হয়; রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারিলে সর্প-ভ্রম থাকেনা; শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলে রজত-ভ্রম থাকেনা। তদ্রূপ, ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া চিনিতে পারিলে আর জগদ্-ভ্রম থাকেনা—তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোথাও কিছুই নাই। এইরূপ যে মত, তাহাকে বলা হয় বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্ত অর্থ ভ্রম।

এত কহি বিবর্ত্তবাদ ইত্যাদি—শঙ্করাচার্য্য বলেন—"পরিণামবাদে নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং পরিণামবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে হয় না; সুতরাং বিবর্ত্তবাদই গ্রহণীয়। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে—ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র।" শঙ্করাচার্য্য এই মত স্থাপন করিলেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ তাঁহার শুক্তি-রজত এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তদ্বয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কোনও শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; অন্ততঃ তদনুরূপ কোনও শ্রুতিবাক্য তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় একইরূপ—তাহাদের একটীর যে সার্থকতা, অপরটীরও ঠিক তদ্রূপই সার্থকতা। শুক্তি (ঝিনুক) দেখিলে যে রজতের (রৌপ্যের) জ্ঞান জন্মে, তাহা যেমন অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্তাহীন; রজ্জু দেখিলে যে সর্পের জ্ঞান জন্মে, তাহাও তেমনি অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্তাহীন। পূর্ব্বে রৌপ্য দেখিয়া রৌপ্যের চাকচিক্য সম্বন্ধে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহার একটা ধারণা বা সংস্কার জন্মিয়াছে, তিনি যদি ঝিনুক দেখেন, ঝিনুকের চাকচিক্যে তাঁহারই মনে রৌপ্যের ভ্রান্তজ্ঞান জন্মিতে পারে। তদ্রূপ পূর্ব্বেই যিনি সর্প দেখিয়াছেন, রজ্জু দেখিলে তাঁহারই মনে আকৃতির সাদৃশ্যবশতঃ সর্পের ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে। রজ্জু দর্শনে যাঁহার সর্পের জ্ঞান জন্মে, তাঁহার জ্ঞানটী যে ভ্রান্তিমাত্র, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করা যায়; আবার শুক্তি-দর্শনে যাঁহার রজতের জ্ঞান জন্মে, তাঁহার জ্ঞানটীও যে ভ্রান্তিমাত্র, তাহাও রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়; যেহেতু, উভয়স্থলেই দৃষ্টান্ত-দার্ষ্ট্যান্তিকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দৃষ্টান্তদ্বয়ের কোনওটী দ্বারাই ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধটী প্রতিপন্ন করা যায় না; কারণ, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্ট্যান্তিকের কোনও বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। তাহাই দেখান হইতেছে।

জগতের সহিত ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ব্রহ্ম হইলেন জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ; জগৎ হইল ব্রহ্মের কার্য্য। ইহা শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব"-ইত্যাদি তৈত্তিরীয়-বাক্যে, "এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"-ইত্যাদি মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌-বাক্যে এবং এইরূপ বহু বহু শ্রুতিবাক্যে তাহারই স্পষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান। কিন্তু শ্রীপাদশঙ্করের অবতারিত শুক্তিরজতের বা রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে এজাতীয় কোনও সম্বন্ধই নাই। ঝিনুক হইতে রৌপ্যের জন্ম হয় না, রজ্জু হইতেও সর্পের উদ্ভব হয় না। ঝিনুকের সহিত রৌপ্যের, বা রজ্জুর সহিত সর্পের কোনও সম্বন্ধই নাই। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ তদ্রূপ নহে; ব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভব, ব্রহ্মেই জগতের স্থিতি। ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত—বস্ত্রে সূত্রের ন্যায়। কারণব্যতীত কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সূত্র ব্যতীত বস্ত্র হইতে পারে না; তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণের ধর্ম্মবিশেষই কার্য্য; কার্য্য হইতে কারণ, কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ নহে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে "ঐতদাত্ম্যমিদম্ সর্ব্বম্"—এই ৬।৮।৭-ছান্দোগ্যবাক্য এবং "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম"—এই ৪।৪।১৯ বৃহদারণ্যক-বাক্যের সমালোচনা পূর্ব্বক ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন—"তদেবং কারণস্যৈব ধর্ম্মবিশেষঃ কার্য্যত্বং ন তু পৃথক্ তদস্তি॥ ১৪৬ পৃঃ॥" আবার "ভাবে চোপলব্ধেঃ" এবং "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" এই ২।১।১৫-১৬ ব্রহ্মসূত্রদ্বয়েও সেই কথাই বলা হইয়াছে। এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও কার্য্য-কারণের অপৃথকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব কারণস্য কার্য্যমুপলভ্যতে। ২।১।১৫ সূত্র ভাষ্যারম্ভে॥ ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বং যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে—সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ॥ ২।১।১৬ সূত্র ভাষ্যে॥—বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্য হইতেও কার্য্যকারণের অনন্যত্ব বুঝায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ জগৎ যে কারণরূপে কারণে অবস্থিত ছিল, শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়। যথা শ্রুতি বলেন—হে সৌম্য, এ সকল অগ্রেই বিদ্যমান ছিল; সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই) ছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়—জগৎরূপ কার্য্য, কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।" বস্তুতঃ কারণেরই ব্যক্তরূপ হইল কার্য্য। এইরূপই যখন ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ; তখন শুক্তির সহিত রজতের, কিম্বা রজ্জুর সহিত সর্পের সম্বন্ধও যদি ঠিক তদ্রূপই হয়, তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্ট্যান্তিক জগদ্‌-ব্রহ্মের সাদৃশ্য থাকিতে পারে এবং তাহা হইলেই দৃষ্টান্ত সার্থক হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সেই সার্থকতা নাই। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ঝিনুক হইতে রৌপ্যের, বা রজ্জু হইতে সর্পের জন্ম হয় না। জগৎ ও ব্রহ্ম যেমন কার্য্য-কারণরূপে এক বা অপৃথক্, ঝিনুক ও রৌপ্য তদ্রূপ নহে। ব্রহ্মকে বাদ দিয়া জগতের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না; কিন্তু ঝিনুককে বাদ দিয়াও রৌপ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। বণিকের দোকানে ঝিনুক না থাকিলেও রৌপ্য দেখা যাইতে পারে। বিবর্ত্তবাদীদের শুক্তি-রজতের উদাহরণের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে হইলে মৃত্তিকাব্যতীতও ঘটাদির উপলব্ধি স্বীকার করিতে হয়। "ভাবে চোপলব্ধেঃ"-এই ২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে যে, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব শ্রীপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত—সূত্ররূপ কারণের সত্ত্বাতেই বস্ত্ররূপ কার্য্যের উপলব্ধি, মৃত্তিকারূপ কারণের সত্ত্বাতেই ঘটরূপ কার্য্যের উপলব্ধি—ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন। তাহা হইলে তিনি যখন শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ বুঝাইতে চাহিতেছেন, তখন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় যে—শুক্তিরূপ কারণের সত্ত্বাতেই রজতরূপ কার্য্যের উপলব্ধি। কিন্তু শুক্তির সত্ত্বাব্যতীতও রজতের সত্ত্বার উপলব্ধি প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তাই শ্রীপাদজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অস্য সূত্রস্য (২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রস্য) কারণভাব এব কার্য্যভাবোপলব্ধিরিতি বিবর্ত্তবাদিনাং ব্যাখানে তু মৃত্তিকাভাব এব ঘটোপলব্ধিবৎ শুক্তিভাব এব রজতোপলব্ধে-রাবশ্যকত্বং চিন্ত্যম্। বণিগ্‌বীথ্যাদৌ তদভাবেঽপি রজতদর্শনাৎ। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৬ পৃঃ॥" সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই যদি শুক্তি-রজত বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই দৃষ্টান্তের কোনওরূপ সার্থকতাই নাই।

আবার যদি কেহ বলেন—ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্য শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয় নাই। শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান জন্মে, সেই রজতের যেমন কোনও বাস্তব সত্ত্বাই নাই, উহা যেমন নিছক একটা ভ্রান্তিমাত্র; তদ্রূপ, যাহাকে তোমরা এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মনে করিতেছ, তাহাও একটা নিছক্ ভ্রান্তিমাত্র, এই তথাকথিত পরিদৃশ্যমান্ জগতেরও কোনও বাস্তব-সত্ত্বাই নাই—ইহা বুঝাইবার জন্যই শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, যদি পরিদৃশ্যমান্ জগতের বাস্তব-সত্ত্বাহীনতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিবর্ত্তবাদীর এই প্রয়াস একেবারেই বৃথা; যেহেতু, ইহা শ্রুতিবিরোধী। তাহাই দেখান হইতেছে।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কথা বলা হইয়াছে। যাহার কোনও বাস্তব-সত্ত্বাই নাই, তাহার জন্মাদির কথাই উঠে না। আকাশ-কুসুমের জন্মাদির কথা কেহ বলে না। ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, এসম্বন্ধে শ্রুতিতে দ্বিমত নাই; বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কার্য্যেরই যদি কোনও রূপ সত্ত্বা না থাকে, কার্য্যটা যদি আকাশ-কুসুমবৎ অলীকই হয়, তাহার কারণত্বের কথা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিবেন কেন? এবং তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য ভাষ্যকারই বা এত শ্রম স্বীকার করিলেন কেন?

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—"এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ॥৫.২॥" তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥১।৮॥" মাণ্ডুক্য বলেন—"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥" এইরূপ অনেক শ্রুতিবাক্য আছে। এই সকল শ্রুতিবাক্যে "এতদ্—এই" এবং "ইদম্—ইহা" এইরূপ শব্দ দ্বারা যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বকই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে দেখাইয়া বলিতেছেন—"এই যে তোমার সর্ব্বদিকে যাহা দেখিতেছ, ব্রহ্মই তৎসমস্ত। যাহা দেখিতেছ, তাহা কালের অধীন; এতদ্ব্যতীত যাহা কালের অতীত, তাহাও ব্রহ্মই, ওঙ্কারই। এই ব্রহ্মই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, যোনি, ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু।" পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কালের অধীন বলিয়াই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলা হইয়াছে। সর্ব্বদিকে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার যে কোনও সত্ত্বা নাই—একথা শ্রুতি বলেন নাই; সত্ত্বা না থাকিলে ব্রহ্মকে তাহার অন্তর্য্যামী, তাহার যোনি (কারণ) বলা হইত না। যাহার সত্ত্বাই নাই, তাহার কারণের কথাও উঠে না, অন্তর্য্যামীর কথাও উঠে না। পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্ত্বা আছে; তবে সে সত্ত্বা নিত্য নয়, তাহার বিনাশ আছে, যেহেতু তাহা কালের অধীন—একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। যাহার সত্ত্বা নাই, তাহার কালাধীনত্বও হইতে পারে না। পরিদৃশ্যমান্-জগৎ যে ব্রহ্মেরই একটী রূপ, এবং তাহা যে অনিত্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা সূচিত হয়। বৃহদারণ্যকে এসম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখও আছে। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈব মূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যঞ্চ ।৩।২।১॥—ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। যাহা মূর্ত্ত, তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশী); যাহা অমূর্ত্ত, তাহা অমৃত (নিত্য); মূর্ত্তরূপ স্থিত (পরিচ্ছিন্ন) এবং সৎ (উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট —ব্যক্তরূপবিশিষ্ট) এবং অমূর্ত্তরূপ ব্যাপক (অপরিচ্ছিন্ন) এবং ত্যং (অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট, অব্যক্তরূপবিশিষ্ট)।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবেই জানা গেল—পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ব্রহ্মেরই মূর্ত্তরূপ, তাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ, এবং বিনাশ-শীল। পরিচ্ছিন্ন এবং বিনাশশীল শব্দ-দুইটী হইতেই জানা যাইতেছে—তাহার অস্তিত্ব আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মরূপ কারণের সত্যত্বেই কার্য্যরূপ জগতের সত্যত্ব; ব্রহ্মেই জগৎ অধিষ্ঠিত। কার্য্য কারণে অধিষ্ঠিত বলিয়াই কারণের জ্ঞান না থাকিলেও অনেকসময় কার্য্য হইতেই কারণের জ্ঞান জন্মিতে পারে। একখানা কাপড় ভালরূপে দেখিলেই তাহার কারণরূপ সূতা তাহাতে দৃষ্ট হয়। যেহেতু, কারণ ও কার্য্য অনন্য। তাই, কারণ সত্য বলিয়া কার্য্যও সত্য। "তস্মাৎ কার্য্যস্যাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৭ পৃঃ॥" জগতের কারণ ব্রহ্ম হইলেন সত্য বস্তু, আকাশ-কুসুমবৎ অলীক বস্তু নহে; তাহার কার্য্য এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎও সত্য—তবে নিত্য নহে। ইহাই সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত এস্থলেও খাটে না। শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান জন্মে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র; যেহেতু, তাহার কোনও সত্ত্বাই নাই; কিন্তু পরিদৃশ্যমান্ জগতের অস্তিত্ব বা সত্ত্বা আছে, যদিও সেই সত্ত্বা অনিত্য।

বিবর্ত্তবাদীদের শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে আরও একটী দোষ জন্মে। শুক্তি কখনও রজতের কারণ নহে; ব্রহ্ম ও জগতে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে গেলে—ব্রহ্ম ও জগতের কারণনহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাও সর্ব্বশ্রুতিবিরোধী।

যদি কেহ আবার বলেন—পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্ত্বা অনিত্য, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। উত্তরে বলা যায়—তাহা নয়। কারণ, যে রজতের সঙ্গে জগতের উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিত্য তো নয়ই, অনিত্যও নয়; যে হেতু তাহার কোনও সত্ত্বাই নাই, তাহা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। আর যদি অনিত্যত্ব প্রদর্শনই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বিবর্ত্ত-শব্দই ব্যবহৃত হইত না। বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ ভ্রান্তি। ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি ইহাই বিবর্ত্তবাদীর প্রতিপাদ্য। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যোপক্রমে নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে (শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে নহে) শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঝিনুক দেখিয়া যে রজতের জ্ঞান হয়, ইহা ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তি দূর হইলেই জানা যায়—রজত ওখানে নাই, আছে ঝিনুক। তদ্রূপ, এইযে জগৎ দেখিতেছ —ইহাও ভ্রান্তিমাত্র; এই ভ্রান্তি দূর হইলে দেখিবে—এখানে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, আছে ব্রহ্ম। ইহাই বিবর্ত্ত-বাদীর প্রতিপাদ্য। প্রশ্ন হইতে পারে—ঝিনুক দেখিলে যে রজতের ভ্রম জন্মে, এই ভ্রমের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। যে পূর্ব্বে বাস্তবিক রৌপ্য দেখিয়াছে, তাহারই ঐরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, অন্যের জন্মিতে পারে না। রজতের চাকচিক্যের সংস্কারই এই ভ্রমের ভিত্তি। চাকচিক্যে শুক্তি ও রজতের সাদৃশ্য আছে; এই সাদৃশ্য হইতেই ভ্রান্তি। কিন্তু ব্রহ্মেতে জগতের ভ্রান্তি, তাহা কোন্ সত্যবস্তু দর্শনজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন? যদি বল, বাস্তব জগতের দর্শনজনিত সংস্কার হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাহা হইলে তো জগতের বাস্তবতাই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর উত্তর দিয়াছেন—এই সংস্কার কোনও বাস্তবজগতের দর্শন হইতে জন্মে নাই; এই ভ্রান্তসংস্কার অনাদিসিদ্ধ। ইহা বাস্তবিক কোনও উত্তর নহে; ইহা হইতেছে—অনাদিত্বের আশ্রয়ে উত্তর দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার বৃথা প্রয়াস মাত্র। যে বস্তুর কোনও সত্ত্বাই নাই, তাহা কোনও সংস্কারই জন্মাইতে পারে না। দৃষ্টশ্রুত বস্তু হইতেই সংস্কার জন্মে। যাহা সত্য নয়, তাহা দৃষ্ট হইতে পারে না, শ্রুত হইতে পারেনা; সুতরাং তাহা কোনও সংস্কারও জন্মাইতে পারে না। কোনও কোনও সময়ে অলীক বস্তুর কল্পনা আমরা করিয়া থাকি; তাহাও সত্যবস্তু হইতে জাত সংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত; যেমন, সত্য কুসুমের সংস্কার হইতে অলীক আকাশ-কুসুমের কল্পনা। যদি জগতে কুসুম বলিয়া কোনও বস্তু না থাকিত, আকাশ-কুসুমের কল্পনাও সম্ভব হইত না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর একটী কথা। বিবর্ত্তবাদী বলেন—শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রান্তি, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রান্তি, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি। কিন্তু দুইটী বস্তুর মধ্যে কোনও না কোন এক বিষয়ে সাদৃশ্য না থাকিলে একটীকে অপরটী বলিয়া ভ্রম জন্মেনা। শুক্তি ও রজতের মধ্যে চাকৃচিক্যের সাদৃশ্য আছে; রজ্জু ও সর্পে আকারের সাদৃশ্য আছে। তাই শুক্তি দেখিলে রজতের ভ্রম এবং রজ্জু দেখিলে সর্পের ভ্রম জন্মিতে পারে; কিন্তু কস্মিন্‌কালেও শুক্তিতে সর্পের ভ্রম, কিম্বা রজ্জুতে রজতের ভ্রম জন্মিবেনা—কারণ, সাদৃশ্যের অভাব। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে, বিবর্ত্তবাদীর দৃষ্টান্তকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কোনও না কোনও বিষয়ে সদৃশ্য আছে, নতুবা ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি জন্মিতে পারেনা। কিন্তু সাদৃশ্য কোন্ বিষয়ে? আমরা তো জগতের একটা রূপ দেখিতে পাই—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্ত বৈচিত্র্যময় একটা রূপ। এই রূপের সঙ্গেই কি ব্রহ্মের সাদৃশ্য? ব্রহ্মও কি এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের ন্যায় অনন্ত-বৈচিত্রীময় রূপবিশিষ্ট একটা বস্তু? কিন্তু বিবর্ত্তবাদী যে বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন নিরাকার, নির্ব্বিশেস, নিঃশক্তিক। নিরাকার নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মে সাকার সবিশেষ এবং বৈচিত্রীময়ী শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক জগতের ভ্রান্তি একেবারেই অসম্ভব।

২। আরও একটী কথা। শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম, রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম, সেই ভ্রমের হেতু হইতেছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের আশ্রয় শুক্তিও নয়, রজ্জুও নয়। শুক্তি দেখিয়া যাহার রজতের ভ্রম হয়, রজ্জু দেখিয়া যাহার সর্পের ভ্রম হয়, সেই ব্যক্তিই এই অজ্ঞানের আশ্রয়—অর্থাৎ এই অজ্ঞান তাহারই, শুক্তির বা রজ্জুর নহে। ব্রহ্মে যে জগতের ভ্রম জন্মে, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ—ইহাই বিবর্ত্তবাদী বলেন। ভ্রম জন্মে জীবেরই, জীবই অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। তাহা হইলে এই অজ্ঞানের আশ্রয় হইল জীব। কিন্তু বিবর্ত্তবাদীর মতে শুদ্ধ জীব ব্রহ্মই—শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই। এই ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তখনই তাহার জীবসংজ্ঞা। এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই অজ্ঞানের আবরণ থাকিবে, ততদিনই তাহার জীবত্ব এবং ততদিনই ব্রহ্মে তাহার জগদ্‌ভ্রম থাকিবে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে এইযে—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইতে পারেন? সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের ব্যাপ্য হইতে পারেন? সর্ব্বব্যাপক স্বপ্রকাশ আলোক কি কখনও অন্ধকারদ্বারা আবৃত হইতে পারে? জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হওয়া অসম্ভব বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তিও অসম্ভব। অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মই জীব—একথা স্বীকার করিতে গেলে মুক্তির সম্ভাব্যতাও থাকে না; যেহেতু, একবার যখন শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব ব্রহ্মকে অজ্ঞান কবলিত করিতে পারিয়াছে এবং তখন যখন ব্রহ্ম অজ্ঞানকে দূরে রাখিতে পারেন নাই, তখন মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে আবার যে সেই অজ্ঞান তাহাকে কবলিত করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

৩। বিবর্ত্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রমের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। আমরা ব্যবহারিক জগতে অনেক ভুল করিয়া থাকি; কিন্তু সেই ভুলের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। রজ্জু দেখিলে সকলেরই সর্পভ্রম জন্মে না, কাহারও কাহারও লতাদির ভ্রমও জন্মে, কেহ কেহবা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই চিনে। শুক্তি দেখিলেও সকলেরই ভ্রম হয় না। যাদের হয়, তারাও সকলে শুক্তিকে রজত মনে করেনা, কেহ কেহ ক্ষুদ্র লবণকণিকার স্তূপ বা তজ্জাতীয় অন্য বস্তু বলিয়াও মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রম এক অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুসরণ করিয়া থাকে। একজন লোক যাকে আমগাছ বলিয়া ভ্রম করে, অপর সকল মানুষই তাকে আমগাছ বলিয়াই ভ্রম করে,—তালগাছ, বাঘ, গরু, মানুষ বা অপর কিছু বলিয়া ভ্রম করেনা। মনুষ্যেতর জীবের ভ্রমও ঠিক মানুষের তুল্যই। গোবৎসকে চতুষ্পদ বলিয়া মানুষের যেমন ভ্রম জন্মে, অপর জীবেরও তদ্রূপ ভ্রমই জন্মে—একপদ, ত্রিপদ, বা অষ্টপদাদি বলিয়া কাহারও ভ্রম জন্মে না। নরশিশুকেও কেহ একপদ বা চতুষ্পদাদি বা বৃক্ষাদি বলিয়া ভুল করেনা। জন্ম-মৃত্যু-আদির নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান (যাহা বিবর্ত্তবাদীর মতে ভ্রান্তি মাত্র), তাহাও সর্ব্বত্র অব্যভিচারী বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই। বিবর্ত্তবাদীর মতে রোগাদিও তো ভ্রান্তিই, কিন্তু রোগাদির চিকিৎসার যে নিয়ম অনুসৃত

বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ। 'দেহে আত্মবুদ্ধি' এই বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়, তাহারও ব্যভিচারিত্ব দৃষ্ট হয় না। কুইনাইনদ্বারা উদরাময় বা বসন্তের চিকিৎসা হয় না। নিয়মের বা শৃঙ্খলার অব্যভিচারিত্ব একমাত্র সত্যবস্তুর পক্ষেই সম্ভব, মিথ্যা বা অলীক বস্তুতে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব কল্পনার অতীত। জগতিক নিয়মের পূর্ব্বোল্লিখিত অব্যভিচারিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে, এই জগৎ মিথ্যা বা অলীক নহে, ভ্রান্তিমাত্র নহে, পরন্তু ইহা সত্য এবং সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অব্যভিচারিত্বে বিবর্ত্তের স্থান থাকিতে পারেনা।

বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদিসম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহাদিগকে অলীক বলিয়া মনে করিতে হয়; এমন কি, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধন-ভজনাদি সম্বন্ধীয় বাক্যগুলিরও কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। মিথ্যা বা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদির সার্থকতা কোথায়? কিন্তু পরিণামবাদ স্বীকার করিলে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধন-ভজনাদি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবাক্যগুলিও সার্থক হইতে পারে; ব্যবহারিক জগতের নিয়মাদির অব্যভিচারিত্বেরও সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাইতে পারে।

১১৬। পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ করিয়া প্রভু মীমাংসা করিতেছেন, ১১৬-১২০ পয়ারে। তিনি বলেন, "পরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ, সুতারাং তাহাই প্রামাণ্য। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন; সুতরাং পরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকারী বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা নাই —অথচ সূত্রের মুখ্য অর্থও অসঙ্গত হয় না; কাজেই মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করার কোনই প্রয়োজন নাই। ব্রহ্ম-শব্দের গৌণার্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি অস্বীকার করিয়াছেন; শক্তি অস্বীকার করাতেই অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, তাহা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই; কাজেই তাঁহাকে মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাতেও গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গৌণার্থ অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪।১১৫ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

বস্তুত—প্রকৃত প্রস্তাবে; ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থে। **পরিণামবাদ** ইত্যাদি—পরিণামবাদই প্রমাণস্থানীয়। ইহার ধ্বনি এই যে, শঙ্করের গৌণার্থ-লব্ধ বিবর্ত্তবাদ প্রামাণ্য নহে। "ভ্রান্ত্যধ্যাসপর্য্যায়োঽতাত্ত্বিকান্যথা ভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ। তস্মাৎ তাত্ত্বিকান্যথা ভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ।—স্থূলার্থ, পরিণামবাদই শাস্ত্রীয়। ব্রহ্মসূত্র। ১।৪।২৬ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৫ পয়ারেরর টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, পরিণামবাদই যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয় এবং বিবর্ত্তবাদ যদি অসঙ্গতই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "দেহে আত্মবুদ্ধি" ইত্যাদি।

দেহে আত্মবুদ্ধি—অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি। দেহ অনাত্ম বস্তু, নশ্বর বস্তু; সাধারণ জীব এই অনাত্ম দেহকেই আত্মা—জীবাত্মা—বলিয়া মনে করে—দেহের সুখ-দুঃখকে জীবাত্মার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। মায়াবদ্ধ জীব আমরা মনে করি—আমার দেহই আমি; দেহের কোনও স্থানে রোগ হইলে আমি মনে করি, আমারই রোগ হইয়াছে; কিন্তু দেহ আমি নই; দেহ পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য বস্তু ইহার জন্ম-মৃত্যু আছে; কিন্তু স্বরূপতঃ যে আমি—যে আমি জীবাত্মা—তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, মৃত্যু নাই, তাহা নিত্য শাশ্বত। ইহাতে আমাদের অনুভূতি নাই বলিয়াই আমরা দেহদৈহিক বস্তুকেই "আমি আমার" মনে করি; এইরূপ দেহের সুখ-দুঃখাদিকে আমার সুখ-দুঃখাদি মনে করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি, মায়াজালে আরও অধিকতর রূপে জড়িত হইয়া পড়ি; মায়াজাল ছেদনের নিমিত্ত ভগবৎউন্মুখী হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করি না। এইরূপে যে অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের ভ্রম—অনাত্ম-দেহে আত্মভ্রম—ইহাই বিবর্ত্ত।

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১১৯
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই বিবর্ত্তের স্থান—এইরূপে যে অনাত্ম-দেহে আত্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের ভ্রম—অনাত্মদেহে আত্ম-ভ্রম—ইহা বিবর্ত্ত। মায়াবদ্ধ জীবের বৈরাগ্য-উৎপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ এইরূপ দেহে-আত্মবুদ্ধি-স্থলেই বিবর্ত্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া এই বিবর্ত্ত বা ভ্রমের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমকে বিবর্ত্ত বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। "এবং ক্বচিৎ তদুক্তির্বিরাগায়ৈবেতি তত্ত্ববিদঃ। ব্রহ্মসূত্র। ১।৪।২৬। সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।"

১১৭—১২০। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে ঈশ্বর অবিকারী থাকেন, তাহা দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকিতে পারেন।

সাধারণতঃ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত বস্তুর দৃষ্টান্তই আমাদের তর্কযুক্তিতে আমরা ব্যবহার করি; যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রাকৃত জগতেই সীমাবদ্ধ, অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ অভিজ্ঞতাই নাই; বিশেষতঃ প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্তও সকল বিষয়ে ও সকল সময়ে অপ্রাকৃত জগতে খাটিতে পারেনা; কারণ, দুই জগতের ব্যাপারের স্বরূপই সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে—বিশেষতঃ ঈশ্বরের শক্তি-আদি সম্বন্ধে—প্রাকৃত জগতের কোনওরূপ যুক্তিতর্ক বা দৃষ্টান্ত দ্বারাই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥—অচিন্ত্য-বিষয়-সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি প্রয়োগ করিবেনা; প্রকৃতির অতীত (অর্থাৎ অপ্রাকৃত) যাহা, তাহাই অচিন্ত্য। ব্রহ্মসূত্র।২।১.৬ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যধৃত স্কান্দবচন।"

ঈশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য—আমাদের চিন্তার বা ধারণার বা যুক্তিতর্কের অতীত; এই শক্তির প্রভাবে, জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ঈশ্বর অবিকৃত থাকিতে পারেন। প্রাকৃত জগতে দেখা যায়—দধিরূপে পরিণত হইয়া দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায়—অবিকৃত থাকিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ নহে—জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন; ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির একটী নিদর্শন।

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত—যাঁহার শক্তি চিন্তার বা তর্কযুক্তির বিষয়ীভূত নহে; সাধারণ তর্কযুক্তি দ্বারা যাঁহার শক্তিকার্য্য-সম্বন্ধে কোনওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। **ইচ্ছায় জগদ্রূপে** ইত্যাদি—ভগবান্ নিজের ইচ্ছাতেই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন, কাহারও অনুরোধে বা কোনওরূপ কর্ম্মের বশে নহে। ইহাও তাঁহার একটী লীলা।

তথাপি—জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও, সুতরাং বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও।

জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন, প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতেছেন।

চিন্তামণি—এক রকম মণিবিশেষ; ইহা হইতে নানাবিধ রত্নের উদ্ভব হয়; তথাপি কিন্তু ইহা কোনওরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না—পূর্ব্বে যেমন থাকে, রত্নপ্রসবের পরেও তেমনই থাকে।

প্রাকৃতবস্তুতে ইত্যাদি—প্রাকৃতবস্তু-চিন্তামণিরই যখন এত শক্তি (নানারত্ন প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকিতে পারে), তখন অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ঈশ্বর নিজে বিকার প্রাপ্ত না হইয়াও যে জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রণব সে মহাকাব্য— বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম। সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২১। এক্ষণে মহাবাক্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন "তত্ত্বমসিই"-মহাবাক্য; মহাপ্রভু তাহা খণ্ডন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন যে, প্রণবই মহাবাক্য, ১২১—১২৩ পয়ারে।

মহাবাক্য—বর্ণনীয় বিষয়-সমূহ যে বাক্যে থাকে, তাহাকে মহাবাক্য বলে। বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যম্॥ যেমন, "রামায়ণ" বলিলেই আমরা এমন একটী জিনিস বুঝি, যাহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব ও লীলাদি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; এইরূপে, শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় রামায়ণে আছে বলিয়া "রামায়ণ" হইল শ্রীরামবিষয়ক মহাবাক্য। এইরূপে, "মহাভারত" হইল কুরুপাণ্ডবদের সম্বন্ধে মহাবাক্য। কিন্তু—রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি হইল আপেক্ষিক মহাবাক্য—বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে মহাবাক্যমাত্র। নিরপেক্ষ মহাবাক্য হইবে তাহা—রামায়ণ বা মহাভারতের ন্যায় কোনও একটী বিশেষ বিষয়ই যাহার লক্ষ্য নহে—পরন্তু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের যেখানে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই যাহার লক্ষ্য, তৎসমস্তই যাহার অন্তর্ভূত। আলোচ্য পয়ার-সমূহে এরূপ একটী মহাবাক্যের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"মহাবাক্যঞ্চ বাক্যসমুদায়ঃ। অস্যার্থস্তু উপক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধার্য্যতে। তথাহি—উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥ ইতি॥ উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বং পৌনঃপুন্যং অনধিগমত্বং ফলং প্রশংসা যুক্তিমত্ত্বঞ্চেতি ষড়্‌বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি। এবমু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থঃ অবগন্তব্যঃ। সর্ব্বসম্বাদিনী। ২১ পৃঃ॥—বাক্য সমুদায়কে মহাবাক্য বলে। উপক্রম-উপসংহারাদিদ্বারাই মহাবাক্যের অর্থ অবধারিত হয়। উপক্রম-সংহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই সকল হইল শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ—উপক্রম ও উপসংহারের একরূপত্ব, পৌনঃপুন্য (অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ উল্লেখ), অনধিগমত্ব, ফল, প্রশংসা ও যুক্তিমত্ত্ব—এই ছয়টী উপায়দ্বারাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপে, অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারপ্রণালী অবলম্বনে গতিসামান্যদ্বারাও মহাবাক্যের অর্থনির্ণয় করা কর্ত্তব্য।" শ্রীজীবের এই উক্তি হইতে জানা যায়—বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-পুরাণ-ইতিহাসাদির মুখ্য বক্তব্য বিষয়-সমূহ সূক্ষ্মরূপে যাহার মধ্যে (বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায়) অবস্থিত, যাহার কথা এই সমস্ত শাস্ত্রে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী প্রণালীতে এবং উপক্রম-উপসংহারাদিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই মহাবাক্য। এইরূপ লক্ষণ একমাত্র প্রণবেরই আছে, অপর কোনও বাক্যেরই নাই। (**প্রণব**—ওঙ্কারকে প্রণব বলে)। তাহার হেতু এই।

শ্রুতি বলেন—প্রণবই ব্রহ্ম। "এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।২॥—হে সত্যকাম, এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্ম।" তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥ ১।৮॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কারই।" মাণ্ডুক্য-উপনিষৎও বলেন—"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বম্ তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বম্ হি এতদ্ ব্রহ্ম অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥—ওঙ্কারই অক্ষর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালের প্রভাবাধীন এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই ওঙ্কারই, ওঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতুভূত।" এসমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ওঙ্কার এবং ওঙ্কার হইতেই উদ্ভূত, ওঙ্কার হইতেই এই জগতের স্থিতি ও লয়। এই জগতের অতীত যাহা, তৎসমস্তও এই ওঙ্কারই। ওঙ্কারই সর্ব্বকারণ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, ওঙ্কারই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী। অর্থাৎ ওঙ্কার ব্যতীত কোথাও অন্য কিছুই নাই। ওঙ্কারই সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপক। যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত, তৎসমস্তই ওঙ্কারের ব্যাপ্য।

সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সাধনের লক্ষ্য যে এই ওঙ্কারই, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ॥ কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন॥"

বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-পুরাণ-ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন এই ওঙ্কার বা ব্রহ্ম।

প্রণব বা ব্রহ্ম হইতেই যে সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ভব, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্। মৈত্রেয়ী উপনিষৎ ॥৬৩২।" চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি যে ওঙ্কার বা ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত, ওঙ্কারেরই অভিব্যক্তি, এসমস্ত শাস্ত্র যে সূক্ষ্মরূপে ওঙ্কারেরই অন্তর্নিহিত, তাহাও উক্ত উপনিষৎ-বাক্য হইতে জানা গেল। সমগ্র শাস্ত্রবাক্যের সমষ্টিরূপই হইলেন ওঙ্কার। তাই ওঙ্কারই মহাবাক্য। সমস্ত শাস্ত্রেই অন্বয়ী-ব্যতিরেকী মুখে এই ওঙ্কার বা ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে, এই সমস্ত শাস্ত্রে উপক্রম-উপসংহারাদি দ্বারা এই ওঙ্কার বা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাই ওঙ্কারই হইলেন মহাবাক্য।

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এবং জগতিস্থ জীবসমূহ প্রণব হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রণবের সহিত তাহাদের যে একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে—সুতরাং প্রণবই যে সম্বন্ধতত্ত্ব, উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণ হইতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, জগতিস্থ জীব প্রণবের সহিত তাহার এই নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার জন্য জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের একমাত্র হেতুভূত ওঙ্কারের উপাসনার কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। "এষ আত্মা শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের উপাসনার কথাই বলিতেছেন। স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ শ্বেতা।১।১৪॥ এই শ্রুতিবাক্যেও প্রণবের ধ্যানের উপদেশ দিতেছেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য, উপাসনার উপদেশে অভিধেয়-তত্ত্বের কথাই বলিতেছেন। এই উপাসনার ফল কি হইবে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ এব অক্ষরং পরম্। এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ॥ এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"—ইত্যাদি কঠোপনিষদ্বাক্য হইতে জানাযায়, উপাসনাদ্বারা প্রণবকে জানিতে পারিলে, তাঁহার উপলব্ধি হইলে, যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ—যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, এবং সেই প্রণবরূপ ব্রহ্মের লোকও লাভ করিতে পারেন—ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে উপাসনার ফল-স্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্ব প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যও এই তিনটী তত্ত্বই। এই তিনটী তত্ত্বই প্রণবের অন্তর্নিহিত হওয়াতে প্রণবই যে "বাক্যসমুদায়ঃ"-রূপ মহাবাক্য, তাহাই প্রমাণিত হইল।

বেদের নিদান—প্রণবই বেদের নিদান বা মূল; প্রণব হইতেই বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। "ওঁকারাদ্ ব্যঞ্জিতস্পর্শ স্বরোষ্মান্তস্থ ভূষিতাম্। বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্॥

স্থূলার্থঃ—লৌকিক ও বৈদিক বিচিত্র-ভাষায় বিবৃত বৃহদ্ বাক্যময় বেদরাশিকে ওঁকার হইতে ভগবান্ প্রকটিত করিয়াছেন এবং ওঁকারেই আবার উপসংহৃত করেন। শ্রীভা, ১১।২১।৩৯—৪০॥"

ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব—প্রণব ঈশ্বরের বা পরব্রহ্মের স্বরূপ বা একটী রূপ। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।—হে সত্যকাম! যাহা ওঁকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের স্বরূপ। প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২॥" "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ব্রহ্মসূত্র।১।৩।" এই বেদান্তসূত্রানুসারে ব্রহ্মই বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের নিদান হওয়ায় এবং প্রণব ব্রহ্মের একটী স্বরূপ হওয়ায় প্রণবও যে বেদাদি-শাস্ত্রের নিদান, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

"তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ববিশ্বধাম—প্রণব ঈশ্বরের একটী স্বরূপ হওয়ায় এবং ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বের ধাম বা আশ্রয় হওয়ায় প্রণবও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় হইল। **সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের**—যিনি সকলের আশ্রয় বা আধার, সেই ঈশ্বরের (পরব্রহ্মের)। **উদ্দেশ**—লক্ষ্য। **সর্ব্বাশ্রয়** ইত্যাদি—প্রণব সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। প্রণবের লক্ষ্যই হইল সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বর; কিন্তু সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরাশ্রিত সমস্ত বস্তুই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের আশ্রিত বা সংস্পৃষ্ট যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকেই প্রণব উদ্দেশ করে (স্ববিষয়ীভূত করে)

এইরূপে, প্রণব বেদের নিদান বলিয়া বেদ হইল সূক্ষ্মরূপে প্রণবেরই অন্তর্ভূত। প্রণব পরব্রহ্মের স্বরূপ হওয়াতে এবং পরব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই কোথাও না থাকাতে—সমস্ত বস্তুই—সমস্ত বিশ্ব এবং বিশ্বান্তর্গত সমস্ত বস্তুই—পরব্রহ্মের অন্তর্ভূত বা আশ্রিত হওয়াতে, তৎসমস্ত প্রণবেরই আশ্রিত—প্রণবেরই অন্তর্ভূত। তাই বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র, পরব্রহ্ম এবং সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বান্তর্গত সমস্ত বস্তুই প্রণবের লক্ষ্য হওয়ায়—সমস্তই প্রণবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় —প্রণবই হইল মহাবাক্য; ব্রহ্ম-স্বরূপবশতঃ বিভু—ব্রহ্ম-বস্তুর ন্যায় প্রণবও বিভু বা বৃহত্তম বাক্য—মহাবাক্য; অন্য যত কিছু বাক্য আছে, তৎসমস্তই বেদনিদান-প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত—সুতরাং প্রণব অপেক্ষা ক্ষুদ্র। প্রণব হইল ব্যাপক, আর অন্য সমস্ত বাক্য হইল তাহার ব্যাপ্য।

১২২। শঙ্করাচার্য্য বলেন—"তত্ত্বমসি"ই মহাবাক্য। কিন্তু "তত্ত্বমসি" হইল সামবেদীয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠকে প্রসঙ্গাধীন একটা বাক্য। "স আত্মা "তত্ত্বমসি" শ্বেতকেতো ইত্যাদি। ছান্দো। ৬।১৪।৩।" সমগ্র বেদের অন্তর্গত একটী বেদ হইল সামবেদ, সেই সামবেদের অন্তর্গত উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে একটী উপনিষৎ হইল ছান্দোগ্য-উপনিষৎ; সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটী বাক্য হইল তত্ত্বমসি। সমগ্র বেদের বাচক হইল প্রণব; আর বেদ হইল প্রণবের বাচ্য; সুতরাং প্রণব হইল তত্ত্বমসিরও বাচক—প্রণব হইল ব্যাপক, আর তত্ত্বমসি হইল তাহার ব্যাপ্য; প্রণবে যাহা বুঝায়, তাহারই ক্ষুদ্র এক অংশ হইল তত্ত্বমসি। প্রণব ঈশ্বরাদি-পদার্থকেও বুঝায়, তত্ত্বমসি তাহা বুঝায় না। প্রণবের বাচ্য হইল তত্ত্বমসির বাচ্য অপেক্ষা অনেক বেশী; সুতরাং প্রণবের পরিবর্ত্তে, তত্ত্বমসি কখনও মহাবাক্য হইতে পারে না।

তত্ত্বমসি—তৎ (তাহাই—সেই ব্রহ্মই) ত্বম্ (তুমি, জীব) অসি (হও); তুমিই (জীবই) সেই ব্রহ্ম। জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ করাতে শঙ্করাচার্য্য তত্ত্বমসি-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে কেশব-ভারতীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উহার অন্যরূপ অর্থ বলিয়াছিলেন; তাহা এই:—তস্য ত্বম্ = তত্ত্বম্ (ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ সমাস); তত্ত্বমসি = তস্য (তাহার—সেই ব্রহ্মের) ত্বম্ (তুমি—জীব) অসি (হও); তুমি (জীব) ব্রহ্মেরই হও—ব্রহ্মের দাস হও। ইহাই ভক্তিমার্গানুগত অর্থ। ইহা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থও। **বেদের একদেশ**—বেদের এক অংশে স্থিত; বেদের অন্তর্গত একটী বাক্য—তাই ইহা বেদের বাচক নহে; কিন্তু প্রণব হইল বেদের বাচক; বেদের বাচক হওয়াতে প্রণব হইল বেদের এক-দেশস্থিত "তত্ত্বমসি" বাক্যেরও বাচক।

পূর্ব্বপয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, প্রণবে বীজরূপে যাহা আছে, বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং প্রণব হইল বেদের বাচক, আর বেদ হইল প্রণবের বাচ্য। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্বও প্রণবেরই অন্তর্নিহিত। কিন্তু তত্ত্বমসি-বাক্যটী সম্বন্ধতত্ত্বও বুঝায় না, অভিধেয়তত্ত্বও বুঝায় না, প্রয়োজনতত্ত্বও বুঝায় না। ইহা বরং জীবতত্ত্ব বুঝাইতে পারে। জীবের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ, তাহারই একটু আভাসমাত্র এই তত্ত্বমসি বাক্য হইতে জানা যায়। উপাসনার জন্য জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক; এই হিসাবে তত্ত্বমসি-বাক্যকে অভিধেয়-তত্ত্বের অঙ্গমাত্র বলা যায়, অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকাশক বাক্য বলা যায় না। সুতরাং প্রণব যাহা প্রকাশ করেন, তত্ত্বমসি-বাক্য তাহার ক্ষুদ্র একটী অংশমাত্র প্রকাশ করিয়া

প্রণব মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥১২৩

সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকে; তাই ইহা প্রণবার্থ-প্রকাশক বেদের একদেশমাত্র। যদি কেহ বলেন—তত্ত্বমসি-বাক্যের অন্তর্গত "তৎ"-শব্দে তো ব্রহ্ম বা ওঙ্কারকেই বুঝায়; সুতরাং প্রণবের ন্যায় ইহার মহাবাক্যতা থাকিবেনা কেন? উত্তরে বলা যায়—তৎ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় বটে; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে ব্রহ্মকে বুঝায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই বাক্যের অর্থ হইল—তুমি সেই ব্রহ্ম; জীব কি, জীবের তত্ত্ব কি, তাহাই এই বাক্যে বলা হইতেছে; প্রণবের স্বরূপ বলা হয় নাই। আবার যদি কেহ বলেন—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম যখন অভিন্ন, তখন জীবতত্ত্ব বলাতেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হইতেছে। তাহা নয়; এই বাক্যে জীবতত্ত্ব বলাতেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হয় নাই; শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব; এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মের কথাই তত্ত্বমসি-বাক্যে বলা হইয়াছে, অনাবৃত ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই। অনাবৃত ব্রহ্মই বেদাদি-শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। প্রণবের অর্থবাচক শ্রুতিবাক্য দ্বারা পূর্ব্বপয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জগতিস্থ জীব (শঙ্করের মতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্ম) ব্যতীত কালাতীত ব্রহ্ম আছেন। সুতরাং কেবল অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মই সমগ্র ব্রহ্ম নহেন। এই হিসাবেও (শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারেও) তত্ত্বমসি-বাক্যে ব্রহ্মের একদেশমাত্র সূচিত হয়। সুতরাং তত্ত্বমসি-বাক্য মহাবাক্য হইতে পারে না। মহাবাক্যের যে সমস্ত লক্ষণের কথা পূর্ব্বপয়ারের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণও তত্ত্বমসি-বাক্যের নাই। তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্মই বেদ-বেদান্তাদির একমাত্র প্রতিপাদ্য নহে, তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্মই বেদ-বেদান্তিদিতে বিবৃত হয় নাই। বেদ-বেদান্তাদিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার একটী আনুষঙ্গিক অংশমাত্রই হইল তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্ম। বেদ-বেদান্তাদির উপক্রম-উপসংহারাদিতে তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্ম দৃষ্ট হয় না; অন্বয়-ব্যতিরেকী মুখে তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্মও বেদ-বেদান্তাদিতে প্রকাশিত হয় নাই। মহাবাক্যের একটী লক্ষণ হইতেছে গতিসামান্যত্ব—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের গতি যে বাক্যের অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য। "গতি-সামান্যাৎ" এই (১।১।১০) বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের অভিমুখেই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি। "মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতদ্ যদ্ বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং চক্ষুরাদীনামিব রূপাদিষু অতো গতিসামান্যাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্।—জগতের কারণ হইলেন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম—ইহাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য; সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের সমানগতিত্ব এই চেতন ব্রহ্ম কারণের দিকে।" এই উক্তি হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মই ব্রহ্মরূপ (প্রণবই) জগতের কারণ, সুতরাং ব্রহ্মই সম্বন্ধতত্ত্ব, ইহাই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং প্রণবই মহাবাক্য। জীব কখনও জগতের কারণ হইতে পারেনা; সুতরাং জীব কখনও সম্বন্ধতত্ত্বও হইতে পারেনা। তাহা হইলে জীবতত্ত্ববাচী তত্ত্বমসি-বাক্যের মহাবাক্যতা থাকিতে পারে না।

তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর যে তত্ত্বমসিকে মহাবাক্য বলিয়াছেন, তাহার হেতু বোধহয় এই। জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব স্থাপনই তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে তত্ত্বমসি-বাক্যই ছিল তাঁহার প্রধান অবলম্বন। এই বাক্যের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভয় করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রহ্মে একত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। (তাঁহার এই প্রয়াস যে সিদ্ধ হয় নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৭।১১৩ পয়ারের টীকায় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে)। সুতরাং তত্ত্বমসি-বাক্যের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি তত্ত্বমসিকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন।

১২৩। প্রণবই প্রকৃত মহাবাক্য; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই প্রণবের মহাবাক্যত্ব প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রণবের বাচ্যমাত্র "তত্ত্বমসি"-বাক্যেরই মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহা বিচার-সহ নহে।

১২৪। **সর্ব্ববেদ-সূত্রে**—সমস্ত বেদ ও সমস্ত বেদান্তসূত্রে। **করে অভিধান**—অভিধাবৃত্তিতে লক্ষ্য করে। মুখ্যাবৃত্তিকেই অভিধাবৃত্তি বলে; পূর্ব্বোক্ত ১০৩ পয়ারের টীকায় মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **সর্ব্ববেদ-সূত্রে করে** ইত্যাদি—সমস্ত বেদ এবং সমস্ত সূত্র মুখ্যাবৃত্তিতে কৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করে। মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলে দেখা যায়,

স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সূত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রমাণ এই:—"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্। এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্॥ শ্রীভা, ১১।২১।৪৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন "পরম-প্রতিপাদ্যশ্চাহং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ এব ইত্যাহ—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই পরম-প্রতিপাদ্য, তাহাই উক্তশ্লোকে বলা হইয়াছে।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ—আমিই সমস্ত বেদের বেদ্য। ১৫।১৫॥" ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে যে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব দেখিলে বুঝা যাইবে।

মুখ্যবৃত্তি—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **লক্ষণা**—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হইলে) বাচ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা। অলঙ্কার-কৌস্তুভ।২।১২॥" যেমন "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে"—এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে ভাগীরথী-নাম্নী নদীবিশেষকে বুঝায়; তাহা হইলে মুখ্যার্থে উক্ত বাক্যটীর অর্থ এইরূপ হয়—"ভাগীরথী-নাম্নী নদীর মধ্যে ঘোষ বাস করে।" কিন্তু নদীর মধ্যে বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য) অর্থের সঙ্গতি হয় না—মুখ্য অর্থের বাধা জন্মে। তাই, গঙ্গা-শব্দের "গঙ্গাতীর" অর্থ করিতে হইবে—কারণ, গঙ্গাতীরে বাস করা সম্ভব—গঙ্গাতীর, গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্টও বটে; তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে—"গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে।" এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ অর্থ। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়, মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ করা হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণার্থই অসঙ্গত হইবে। **লক্ষণা-ব্যাখ্যান**—লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা। ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পয়ারের মর্ম্ম:—শঙ্করাচার্য্য অভিধাবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিতে বা গৌণবৃত্তিতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তিনি যদি মুখ্যাবৃত্তিতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়—বেদান্ত-সূত্রেরও প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ।

১২৫। মুখ্যাবৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া গৌণবৃত্তিতে বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করার দোষ-সমূহের মধ্যে এই কয়টী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা:—(১) মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও গৌণার্থের আশ্রয় গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ (১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য;) (২) তাহাতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না, কোনও স্থানে আংশিক অর্থ, কোনও স্থানে বা বিকৃত অর্থই প্রকাশ পায়; বেদান্তসূত্রের গৌণার্থ গ্রহণ করায় বিষ্ণুনিন্দা হইয়াছে (১১০ পয়ার), ব্রহ্মের মহিমাকেও খর্ব্ব করা হইয়াছে (১১৩ পয়ার); (৩) ব্যাপ্যকে ব্যাপকের উপরে, বাচ্যকে বাচকের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে (১২১-১২২ পয়ারের টীকা)। এক্ষণে এই পয়ারে আর একটী দোষের উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা এই:—(৪) লক্ষণাবৃত্তিতে বেদবাক্যের অর্থ করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়।

স্বতঃ প্রমাণ বেদ—বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ; বেদের প্রামাণ্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না, করিতেও পারে না; কারণ, বেদ অপৌরুষেয়; স্বয়ং ব্রহ্মের নিশ্বাসরূপেই বেদ প্রকটিত হইয়াছে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ। মৈত্রেয়ী উপনিষৎ।৬।৩২॥" তাই বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি। বেদের কোনও উক্তির মর্ম্ম আমাদের লৌকিক যুক্তিতর্কের অগম্য হইলেও তাহাই স্বীকার্য্য। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ—এই ২।১।২৭ ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। বেদই অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রের মূল; সুতরাং বেদের সহিত যাহার বিরোধ হইবে, তাহা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে, বেদ **প্রমাণ-শিরোমণি**—প্রমাণ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বেদের প্রমাণ অন্যান্য সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে বেদই প্রমাণস্থানীয়। **লক্ষণা করিলে** ইত্যাদি—লক্ষণাদ্বারা বেদের অর্থ

এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১২৬
এইমত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১২৭

সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১২৮
আচার্য্যকল্পিত অর্থ—ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। তাহার কারণ এই—শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, মুখ্যবৃত্তিতেই বেদের বা বেদান্ত-সূত্রসমূহের অর্থ করা যায়, কোনও স্থলে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকে না; এরূপ অবস্থায়, যিনি লক্ষণাদ্বারা অর্থ করিতে যাইবেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে হইবে; কিন্তু এরূপ অসঙ্গতি যখন প্রকৃত প্রস্তাবে নাইই, তখন সেই তথাকথিত অসঙ্গতির মূল হইবে—হয়তঃ ব্যাখ্যাকর্ত্তার ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে অমিল, আর না হয়, বেদ-বহির্ভূত কোনও শাস্ত্রের সঙ্গে অমিল। ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে মিল থাকে না বলিয়া যদি বেদবচনের মুখ্যার্থকে অসঙ্গত বলা হয়, তাহা হইলে বেদবচন অপেক্ষা ব্যক্তিগত মতেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর যদি বেদবহির্ভূত কোনও শাস্ত্র-বচনের সহিত মিল থাকেনা বলিয়া বেদবচনের মুখ্যার্থকে অসঙ্গত মনে করা হয়, তাহা হইলে বেদ-বহির্ভূত শাস্ত্রকেই বেদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উভয় স্থলেই বেদের প্রমাণতাকে উপেক্ষা করা হয় বলিয়া বেদের স্বতঃ-প্রমাণতার হানি হইয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, শঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তিতে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বেদের স্বতঃ-প্রমাণতার হানি করিয়াছেন—তাঁহার কল্পিত অর্থকে প্রামাণ্য করিয়া বেদের প্রামাণ্যতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

১২৬। **এই মত**—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা," এই প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া শঙ্করাচার্য্য যেরূপ গৌণার্থ করিয়াছেন, সেইরূপ। **প্রতিসূত্রে**—বেদান্তের প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যায়। **সহজার্থ ছাড়িয়া**—মুখ্যার্থকে ত্যাগ করিয়া। **গৌণার্থ ব্যাখ্যা** ইত্যাদি—শঙ্করাচার্য্য স্বীয় কল্পিত মতের প্রাধান্য দিয়া সর্ব্বত্র গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১০১ পয়ার হইতে ১২৬ পয়ার পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি।

১২৭। **এই মত**—পূর্ব্বোক্তরূপে। **প্রতিসূত্রে**—বেদান্তের প্রতিসূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যায়। **করেন দূষণ**—দোষ বা ত্রুটী দেখাইলেন। **শুনি চমৎকার** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর মুখে বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত গৌণার্থের অসঙ্গতি শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ প্রভুর পাণ্ডিত্য ও অনুভূতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

১২৮-১২৯। তখন সন্ন্যাসিগণ খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রভুকে বলিলেন:—"শ্রীপাদ! বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করা-চার্য্যকৃত গৌণার্থের তুমি যে ভাবে খণ্ডন করিলে, তাহাতে প্রতিবাদ করার কিছু নাই। শঙ্করাচার্য্যের অর্থ যে সহজার্থ নয়, ইহা যে তাঁহারই কল্পিত অর্থ, তাহা আমরাও জানি; তথাপি যে সেই অর্থের প্রতিই শ্রদ্ধা দেখাই, তাহার কারণ এই যে, আমরাও শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়ভুক্ত—কেবল সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধেই তাঁহার ব্যাখ্যাকে সম্মান করি।"

সম্প্রদায়-অনুরোধে—আমরাও শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া। বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িকতার ভাব মনে থাকিলে নিরপেক্ষভাবে কোনও বাক্যেরই অর্থ করা যায় না, নিরপেক্ষভাবে কাহারও উক্তি বা আচরণের মর্ম্মও গ্রহণ করা যায় না। যাঁহাদের চিত্তে প্রকৃত অর্থ উদিত হয়, স্বসম্প্রদায়ের মতের বিরোধী হইলে সম্প্রদায়ের শাসনের ভয়ে তাঁহারাও তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস করেন না।

এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা বিদ্বৎ-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের ত্রুটী-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই তাঁহাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু পরমার্থলাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও স্ব-সম্প্রদায়ের এবং স্ব-সম্প্রদায়াচার্য্যের মর্য্যাদাই তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল; তাই ঐ সমস্ত ত্রুটীবিচ্যুতি-সম্বন্ধে তাঁহারা কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করিতেন না। এক্ষণে প্রভুর কৃপায় তাঁহাদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা

মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল—॥ ১৩০

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা পরমার্থের মর্য্যাদা অনেক বেশী; সম্প্রদায়ের মর্য্যাদার অনুরোধে পরমার্থকে উপেক্ষা করিলে তাঁহাদের পক্ষে আত্মবঞ্চনাই হইবে। তাই, তাঁহারা অকপটে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিলেন।

১৩০। এপর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ-খণ্ডনের নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু মুখ্যার্থ ব্যক্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল, ততটুকুই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে, স্বতন্ত্রভাবে বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে অনুরোধ করিলে তিনি সূত্র সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে, মুখ্যা বা অভিধা-বৃত্তিতেই সকল সূত্রের অর্থ করা যায়, লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি করিতে হয় না। নিম্ন-পয়ার-সমূহে দিগ্‌দর্শনরূপে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মশব্দের প্রভুকৃত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩১। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বৃহদ্বস্তু ইত্যাদি—বৃংহতি (যিনি নিজে বড় হয়েন) বৃংহয়তি চ (এবং অপরকেও বড় করিতে পারেন, তিনি) ইতি ব্রহ্ম। এইরূপে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ করিলে দেখা যায়—বৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম; যিনি স্বরূপে, শক্তিতে—শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তিনি ব্রহ্ম। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ১।১২।৫৭॥ ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম॥ ২।২৪।৫৩॥" বৃহত্তম তত্ত্ব বলিয়া এই ব্রহ্ম "সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ। ২।২৪।৫৬॥ আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ। শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"বৃহত্ত্বাৎ অতিশয়-বস্তুত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বরূপবিস্তারকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ জগদ্‌যোনিত্বাৎ—তিনি অতিশয় বস্তু বলিয়া, সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া, স্বরূপ-বিস্তারক বলিয়া এবং জগতের মূল বলিয়া ব্রহ্মই পরমাত্মা।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় ব্রহ্ম-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণ-যোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি। তস্য ধ্যেয়স্য সবিশেষত্বং মূর্ত্তিমত্ত্বম্।—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণ-যোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ—এসব বিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, ঊর্দ্ধেও কেহ নাই। ইহাই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্‌ই অভিহিত হইতেছেন; ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। তিনি সবিশেষ, মূর্ত্তিমান্।"

ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ—১০৬ পয়ারে "চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরতত্ত্ব**—বৃহত্তম বস্তু বলিয়া ব্রহ্মই পরতত্ত্ব; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **ধাম**—আশ্রয়; ব্রহ্মই সর্ব্বাশ্রয়-তত্ত্ব।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে গোপাল-তাপনী-শ্রুতির নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়:—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥

অনুবাদ। যাঁহার নয়ন প্রফুল্লকমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার বস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মাল্য-বেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।

এই শ্লোকটী এস্থলে থাকার কোনও হেতু দেখা যায় না; সম্ভবতঃ এজন্যই অধিকাংশ গ্রন্থেই ইহা নাই। যে গ্রন্থে আছে, সেই গ্রন্থে এইরূপে শ্লোকটীর সার্থকতা দেখান যাইতে পারে—ব্রহ্ম-শব্দে যে শ্রীভগবান্‌কে বুঝায়, তাঁহার রূপ-বর্ণনা করার নিমিত্ত উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর—নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ'॥ ১৩২

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩২। **স্বরূপ ঐশ্বর্য্য** ইত্যাদি—তাঁহার স্বরূপও চিন্ময়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যও চিন্ময়; তাঁহার স্বরূপ হইল চিদানন্দময়, তাই মায়াগন্ধহীন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিকার; তাই তাহাও মায়াগন্ধহীন।

মায়াগন্ধ—মায়ার সম্বন্ধ। অদ্বৈতবাদীরা ভগবদ্-বিগ্রহকে মায়িক এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদিকেও মায়িক বলিয়া থাকেন; এই পয়ারার্দ্ধে অদ্বৈতবাদীদের তত্ত্বচুক্তিরও খণ্ডন করা হইল। ১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্—সবিশেষ, সাকার ব্রহ্ম। **সম্বন্ধ**—প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয়। **সকল বেদের** ইত্যাদি—কেবল বেদান্তসূত্রের নহে, সমস্ত বেদেরই মূল প্রতিপাদ্য বস্তু হইলেন ভগবান্ বা সবিশেষ এবং সাকার ব্রহ্ম—যাঁহার স্বরূপও চিন্ময়, ঐশ্বর্য্যও চিন্ময় এবং যিনি মায়াতীত বস্তু।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।"-ইত্যাদি কঠোপনিষদ্‌বাক্য, "ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে"। ইত্যাদি পদ্মপাতালখণ্ডবচন (৯৩।২৬ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১৫ শ্লো)। "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥ মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্॥" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতবচন (১১।২১।৪২-৪৩॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১৬-১৭), "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্॥" ইত্যাদি গোপালতাপনীশ্রুতিবাক্য এবং "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।" ইত্যাদি (১৫।১৫॥) গীতাবাক্যই প্রমাণ করিতেছে যে, পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বেদপ্রতিপাদ্য সম্বন্ধতত্ত্ব। ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুর কথা বলা হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই দ্বিতীয় সূত্রেই সেই ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের—সুতরাং সবিশেষত্বের বা ভগবত্তার—কথা বলা হইয়াছে।

১৩৩। **তাঁরে**—সমস্ত বেদ যাঁহাকে সাকার, সবিশেষ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে। **নির্ব্বিশেষ**—নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্গুণ, কেবল সত্তামাত্রে অবস্থিত। **চিচ্ছক্তি না মানি**—ব্রহ্মের যে চিচ্ছক্তি আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া।

কেবল বেদান্ত নহে, সমস্ত বেদই তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার চিচ্ছক্তি আছে বলিয়াও প্রতিপাদন করিয়াছেন—সেই ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি না মানিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্যই ছিল, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করা। শক্তি স্বীকার করিলে নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না; তাই তিনি শক্তি স্বীকার করেন নাই—যদিও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের নিত্যা অবিচ্ছেদ্যা স্বাভাবিকী স্বরূপগতা শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেতাশ্বতর॥" "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥"-ইত্যাদি কঠোপনিষদ্‌বাক্য এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বসূচক অসংখ্য বাক্য আছে; কিন্তু নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীপাদশঙ্কর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

অর্দ্ধস্বরূপ—অর্দ্ধেক তত্ত্ব; স্বরূপের ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রহ্মের পূর্ণতা। শঙ্করাচার্য্য কেবল স্বরূপমাত্র স্বীকার করিয়াছেন; কাজেই ব্রহ্মতত্ত্বের এক অর্দ্ধেক মাত্র (স্বরূপ মাত্র) তিনি স্বীকার করিলেন, অপর অর্দ্ধেক (শক্তি)

ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায়॥ ১৩৪

সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বীকার করেন নাই। তাহাতে ব্রহ্মের **পূর্ণতা হয় হানি**—পূর্ণতার হানি হইয়াছে। শক্তিহীন ব্রহ্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁহাকে পূর্ণতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব বলা যায় না।

১৩৪। মহাপ্রভু বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য দেখাইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে—কেবল বেদান্তেরই প্রতিপাদ্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নহেন; পরন্তু সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্যও (সম্বন্ধও) তাহাই। এক্ষণে আবার বলিতেছেন—কেবল সম্বন্ধতত্ত্ব-বিষয়েই যে বেদান্তের এবং সমস্ত বেদের মুখ্যার্থে ঐক্য আছে, তাহা নহে—অভিধেয় এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়েও ঐক্য আছে। মুখ্যার্থে বেদান্ত-সূত্রেরই ব্যাখ্যা করা যাউক, কি সমস্ত বেদেরই ব্যাখ্যা করা যাউক—সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে যে, সাধন-ভক্তিই অভিধেয় (ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কর্ত্তব্য) এবং প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রয়োজন। মুখ্যার্থে সমস্ত বেদের সহিত বেদান্তের ঐক্য থাকাতে এই মুখ্যার্থই সুসঙ্গত—ইহাই সূচিত হইতেছে।

১৩৪—১৩৫ পয়ারে অভিধেয়ের কথা বলিতেছেন।

ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু—ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য যে ভগবান্, সেই ভগবানের প্রাপ্তির নিমিত্ত; ভগবানের প্রাপ্তি বলিতে ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি বুঝায়। **শ্রবণাদি ভক্তি**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি। **কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়**—শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৩৫। **সেই**—সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই। **অভিধেয়**—কর্ত্তব্য; অভীষ্টবস্তু পাওয়ার নিমিত্ত যাহা করিতে হয়। **সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম**—(সেই সাধন-ভক্তিকেই) সমস্ত বেদ অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করে; সমস্ত বেদ ইহাই বলে যে—ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেও অভিধেয়-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং সাধনভক্তিই যে অভিধেয়, তাহাও সূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে "অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগ-হেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে।"

পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব। জীবের সহিত তাঁহার একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব সেই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া মায়ার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি ত্রিতাপজ্বালাদির ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। এই জন্মমৃত্যুর এবং ত্রিতাপজ্বালাদির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে উক্ত নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন। ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারাই সেই স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে (১৭।১২১ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য)। এই উপাসনার কথাই অভিধেয়-তত্ত্বের কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৭।১৬॥" শ্রুতিও বলেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন।—ব্রহ্মের আনন্দ অনুভূত হইলে ভয়ের সম্ভাবনা থাকেনা। শ্বেতা-শ্বতরশ্রুতিও বলেন—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।—ভগবানকে জানিলেই সকল পাশ নষ্ট হয়। পাশ-ক্লেশ নষ্ট হইলেই জন্মমৃত্যুরও ব্যাঘাত জন্মে।" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়েতি পুরুষসূক্তে—পুরুষসূক্ত হইতে জানাযায়, তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য পন্থা নাই।" কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমাকে জানা যায়।" গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ভক্ত্যা মামভিজানাতি—ভক্তিদ্বারা আমাকে সম্যক্-রূপে জানাযায়।" শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব গরীয়সী। মাঠর শ্রুতিঃ॥" বেদান্তও একথাই বলেন। "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ॥ ৩।৩।৪৮ সূত্র॥—বিদ্যাই মুক্তির

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একমাত্র কারণ।" এই সূত্রে বিদ্যা-শব্দের অর্থ হইল জ্ঞানপূর্ব্বিকাভক্তি। "বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাঃ তত্বাভিধানাৎ। গোবিন্দভাষ্য।" সূত্রস্থ তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থক। একমাত্র বিদ্যাই মোক্ষহেতু, কর্ম্ম বা বিদ্যাকর্ম্ম নয়। তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষহেতু র্ন তু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যাস্তত্তাবধারণাৎ। গোবিন্দভাষ্য।" কর্ম্মের ফলে ইহকালের এবং পরকালের সুখ-ভোগমাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে সংসার-বন্ধন ঘুচেনা। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশন্তি" —এই গীতাবাক্য এবং "যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। আর জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে বক্তব্য এইযে, ভক্তিসমন্বিত জ্ঞানই মোক্ষসাধক; ভক্তিবিরহিত জ্ঞান কোনও ফল দিতে পারেনা। "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। শ্রী, ভা ১।৫।১২॥" শ্রুতিও বলেন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়, অন্য কোনও উপায়েই তাঁহাকে জানা যায় না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ইত্যাদি। মুণ্ডক। ৩।২।৩॥" গীতাও বলেন—ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন প্রবিষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥—একমাত্র অনন্যভক্তিদ্বারাই আমাকে জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে এবং আমার ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে (সাযুজ্যমুক্তি পাইতে) পারা যায়।" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যদি নির্ব্বাণমোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা।" গীতার এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইল—জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষেও ভক্তির কৃপা অপরিহার্য্য। সুতরাং ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়।

নববিধা সাধনভক্তির কথা বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, (১) শ্রবণ সম্বন্ধে। সে দু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ॥ ঋগ্বেদ।১।৫৬।২॥—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যশঃকথা কর্ণদ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাওয়ার অভ্যাস করুক। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের কথা বেদান্তসূত্রেও দৃষ্ট হয়। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।৪।৪,১॥" (২) কীর্ত্তন সম্বন্ধে। "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচন্। ঋক্ ১।১৫৪।১—আমি এখন শ্রীবিষ্ণুর লীলাকীর্ত্তন করিতেছি। তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীলহুষঃ॥ ঋক্। ১।১৫৫।৪।—ত্রিভুবনেশ্বর, জগৎরক্ষক, কপালু, সর্ব্বেচ্ছাপরিপূরক ভগবান্ বিষ্ণুর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ঋক্। ১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ; তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াও কেবল নামের অক্ষর মাত্রের উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষয়িণী ভক্তি লাভ করিতে পারিব। বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে। ঋক্। ৭।৯৯।৭॥—হে বিষ্ণো, তোমার স্তুতিবাচক আমার বাক্য তুমি সুষ্টুরূপে বর্দ্ধিত কর।" (৩) স্মরণসম্বন্ধে। "প্রবিষ্ণবে শুষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগারায় বৃষ্ণে। ঋক্। ১।১৫৪।৩॥—উরুগায় ভগবানে আমার স্মরণ বলবৎ হউক।" (৪) পাদসেবন॥ "যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি॥ ঋক্। ১।১৫৪।৪॥—যে ভগবানের অক্ষয় এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত তিন চরণ—(চরণের তিন বিন্যাস ভক্তকে) আনন্দিত করে।" (৫) অর্চ্চনসম্বন্ধে। "প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত॥ ঋক্। ১।৫৫।১॥—তোমরা সকলে মহান্ এবং শূরবীর বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর॥ (৬) বন্দনসম্বন্ধে। "নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে। যজুর্ব্বেদ। ৩১।২০॥—পরম-সুন্দর ব্রহ্ম-বিগ্রহকে আমি নমস্কার করি।" (৭) দাস্যসম্বন্ধে। "তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ঋক্। ১।৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো, আমি তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি।" (৮) সখ্যসম্বন্ধে। "উরুক্রমস্য স হি বন্ধু রিত্থা বিষ্ণোঃ। ঋক্। ১।১৫৪।৫॥—তিনি উরুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা।" (৯) আত্মনিবেদন। "ধ পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি॥ ঋক্। ১।১৫৬।২॥—যিনি অনাদি, জগৎস্রষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবান্‌কে (আত্ম)-নিবেদন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।—শ্রবন-কীর্ত্তনাদি নব-ভক্ত্যঙ্গ পূর্ব্বে বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া পরে

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুষ্ঠিত হইলে—অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতিনিমিত্তকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে—ভক্তি বলিয়া গণ্য হয়।" গোপালতাপনী-শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনম্। ইহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্।—তাঁহার সেবাই ভক্তি। ইহকালের বা পরকালের সমস্ত সুখ-ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবলমাত্র তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবাই ভক্তি।"

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভক্তিই মুখ্য অভিধেয়-তত্ত্ব।

১৩৬। এক্ষণে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলিতেছেন। যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৫ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই উপাসনা। ইহাও বলা হইয়াছে যে, পরতত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা জীব ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার সংসার-ভয় জন্মিয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংসারভীতি হইতে উদ্ধারের বাসনা সেই উপাসনার প্রবর্ত্তক মাত্র। উপাসনার প্রভাবে ভগবৎকৃপায় (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—এই শ্রুতিপ্রমাণবলে) যখন সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন বুঝা যায়—পরব্রহ্ম ভগবান্ অপেক্ষা আপন-জন জীবের আর কেহ নাই এবং তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধটীও অতি মধুর; যেহেতু, সেই আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ ব্রহ্মও পরম-মধুর, তাঁহার মাধুর্য্যের সমান বা অধিক মাধুর্য্য আর কোথাও নাই (ন তৎ সমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে—শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি); জীবের আস্বাদনের জন্য, সেই মাধুর্য্যভাণ্ডারের দ্বারা জীবকে বরণ করার জন্য রসঘনবিগ্রহ পরম-মধুর ব্রহ্মও বিশেষ আগ্রহান্বিত (যেহেতু, তিনি সত্যং শিবং সুন্দরম্)। ইহা যখন সাধক জীব বুঝিতে পারে, তখন আর জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনা তাহার থাকে না, নিতান্ত আপন-জনভাবে, প্রাণ-মন-ঢালা প্রীতির সহিত তাঁহার সেবার জন্যই তখন সাধক-জীবের তীব্র লালসা জন্মে। পরম-মধুর রসস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই অকপট সাধকের চিত্তে ঐরূপ সেবা-বাসনা জন্মে। তাই, সাধকের কথা তো দূরে, মোক্ষপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণও যে রসঘনবিগ্রহ পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, শ্রুতিতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই যে সেবাবাসনা, কেবলমাত্র রসঘনবিগ্রহ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই সেবাবাসনা, তাহারই নাম প্রেম। তখন প্রেমই হয় সাধকের একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র পুরুষার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা-তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে (রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি), একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই তাহা সম্ভব—রসস্বরূপকে পাওয়ার অর্থই হইতেছে, তাঁহাকে সেব্যরূপে পাওয়া। যাহা হউক, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের রসস্বরূপত্বের, আনন্দস্বরূপত্বের, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ এইরূপ সেবাবাসনা সাধক-জীবের চিত্তে জাগ্রত হইলেও, ইহার মুখ্যকারণ হইল কিন্তু তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ—নিত্য অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। জীবের সহিত ব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মও জীবের উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সম্বন্ধের জ্ঞান জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিলেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের আকর্ষকত্ব জীবকে বিচলিত করিয়া তোলে—তাঁহার সেবার জন্য। এই সেবাবাসনা সম্বন্ধের জ্ঞান হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহার পশ্চাতে জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধারের বাসনার স্থান নাই। বস্তুতঃ জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের সহিত এই সেবাবাসনারও নিত্যসম্বন্ধ—অগ্নির সহিত অগ্নির জ্যোতির বা দাহিকাশক্তির ন্যায়। মায়াবদ্ধ অবস্থায় সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এই বাসনাও প্রচ্ছন্ন থাকে—কোনও প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ প্রদীপের জ্যোতি যেমন বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না, তদ্রূপ। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় এই সম্বন্ধের জ্ঞান যখন উদিত হয়, উজ্জ্বল হয়, তখন ঐ সেবাবাসনাও আপনা-আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সাধকের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে—সূর্য্যের উদয়ে তাহার কিরণজাল যেমন সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া

পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ ১৩৭

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোলে। জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেমন স্বরূপগত, স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই সম্বন্ধের সহিতও সেবাবাসনার সম্বন্ধ স্বরূপগত, স্বাভাবিক—সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের সহিতও এই সেবাবাসনার তদ্রূপ সম্বন্ধ। এই সেবাবাসনা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধেরই একটা ধর্ম্ম। আলোকহীন সূর্য্যের যেমন কোনও অর্থই নাই, তদ্রূপ এই সেবাবাসনাহীন সম্বন্ধজ্ঞানেরও কোনও অর্থই হয় না। "প্রদীপ আন" বলিলে যেমন আলোক আনাই বুঝা যায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করা বলিলেই সেবাবাসনাকে জাগ্রত করাই বুঝায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য; এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—জীবের চিত্তে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবাবাসনাকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করানই উপাসনার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এই সেবাবাসনাই প্রেম; সুতরাং প্রেমই হইল উপাসনার বা উপাসকের প্রয়োজন। এই সেবাবাসনা জীব-ব্রহ্মের-মধ্যে সম্বন্ধেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা স্বাভাবিক—সুতরাং অহৈতুকী; তাই ইহাই উপাসনার বা উপাসক-জীবের মুখ্য এবং একমাত্র পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু। এজন্যই প্রেমকে মুখ্য-প্রয়োজন-তত্ত্ব-বলা হয়। ১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এস্থলে যাহা বলা হইল, ব্রহ্মসূত্রের "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে।"-এই ৩।৩।২৮ সূত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে আছে—"সম্পরায়ো ভগবান্ সংপরায়ন্তিতত্ত্বানি অস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্রভব ইত্যণ্ স্মরণাৎ। তস্মিন্ সতি ঐচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শঃ ন নিয়তঃ। কুতঃ তর্ত্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেত্তব্যস্য পাশস্য অভাবাৎ। তথা হি অন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।" এই ভাষ্যের স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ—যাঁহাতে সমস্ত তত্ত্ব মিলিত হয়, তিনিই সম্পরায়; ইহাই সম্পরায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সমস্ত তত্ত্বের মিলন হয় পরব্রহ্ম-ভগবানে; সুতরাং সম্পরায়-শব্দে ভগবান্‌কেই বুঝায়। সম্পরায়-শব্দবাচ্য ভগবদ্বিষয়ক প্রেমকেই সাম্পরায় বলে। চিত্তে প্রেম জাগ্রত হইলে ভগবচ্চিন্তা হইয়া পড়ে ঐচ্ছিকী—অর্থাৎ ভগবানের—তাঁহার রূপগুণাদির—চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা মনে জাগে না; অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা দ্বারা প্রেমোদ্ভূতা বাসনা নিয়ন্ত্রিত হয় না; যে হেতু, এখন সংসার-পাশ হইতে উত্তরণের বাসনা থাকে না (তর্ত্তব্যাভাবাৎ—প্রেম বা সেবাবাসনা চিত্তে জাগ্রত হইলে অন্য সমস্ত বাসনা চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়া যায়, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়); বস্তুতঃ, তখন সংসার-পাশই থাকে না; প্রেমের আবির্ভাবে সমস্ত বন্ধন দূরীভূত হয়। এইরূপ উক্তির অনুকূলে ভাষ্যকার শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমের আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-সেবাবাসনা যে স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে, তাহাই এই বেদান্ত-সূত্রে বলা হইল। তাহাতেই প্রেমের প্রয়োজন-তত্ত্বত্ব সিদ্ধ হইল।

পূর্ব্বে অভিধেয়-তত্ত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে যে সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহারই পরিপক্ক অবস্থার নাম প্রেম।

সাধনভক্তি ইত্যাদি—সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, সেই শুদ্ধচিত্তে প্রেমের উদয় হয়।

কৃষ্ণের চরণে ইত্যাদি—প্রেম জন্মিলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় হইতে সাধকের আসক্তি তিরোহিত হয়, কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতেই তাঁহার আসক্তি থাকে না।

অনুরাগ—প্রেম। **রাগ**—আসক্তি।

১৩৭—১৩৮। কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। **পঞ্চম পুরুষার্থ**—১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৩৯
এইমত সবসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া—॥ ১৪০
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন ॥ ১৪১
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণকৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪২
এইমত তা সভার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৪৩
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাধন—যদ্দ্বারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকে ধন বলে; সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট যে বস্তু, তাহা যদ্দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাকে মহাধন বলা যায়। প্রেম লাভ হইলে সর্ব্ব-বৃহত্তম তত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়; তাই প্রেমকে মহাধন বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ—যাহার ফলে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করা যায়। **কৃষ্ণের মাধুর্য্য** ইত্যাদি—প্রেমলাভ হইলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যায়। **প্রেমাহৈতে** ইত্যাদি—প্রেমের প্রভাবে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত স্বীয় প্রেমবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর এবং পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমের একান্ত অধীন; তাই, যে ভক্তের মধ্যে প্রেম আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন। **কৃষ্ণসেবাসুখরস**—শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ, যাহা রসরূপে পরম-আস্বাদনের বস্তু।

১৩৯। ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য)-তত্ত্ব, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজনতত্ত্ব—মুখ্যার্থে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে, ঐ তিনটী তত্ত্বেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা পর্য্যবসিত অর্থাৎ বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ হইতে ঐ তিনটী তত্ত্বই পাওয়া যায়।

১৪০-১৪১। **এই মত**—পূর্ব্বোক্ত মত; মুখ্যার্থ-সম্মত।

বেদময়মূর্ত্তি—বেদই মূর্ত্তি যাঁহার; যাহা হইতে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। **সাক্ষাৎ নারায়ণ**—বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন এক মহিমা প্রকটিত করিলেন, যাহা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসিগণের অনুভব হইল যে, প্রভু সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র নহেন, পরন্তু তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—অপর কেহ নহেন। সাক্ষাৎ-নারায়ণ বলিয়া উপলব্ধি হওয়াতেই তাঁহাকে বেদময়মূর্ত্তি বলা হইয়াছে; কারণ, নারায়ণ হইতেই বেদের উৎপত্তি। "বেদময়"-শব্দ হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে "তোমা হইতে বেদের উদ্ভব; সুতরাং বেদান্তের অর্থ তুমি যাহা বলিবে, তাহাই প্রামাণ্য।"

ক্ষম অপরাধ ইত্যাদি—সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া আমরা (সন্ন্যাসিগণ) তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি; তাহাতে আমাদের বিস্তর অপরাধ হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।

১৪২। সন্ন্যাসীদের অনুনয়ে প্রভু তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই তাঁহাদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল—পূর্ব্বে প্রভুর নিন্দা করিতেন, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের নিন্দা করিতেন; কিন্তু এখন হইতে সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১৪৩। **তা সভার**—কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসীর।

কৃষ্ণনাম ইত্যাদি—তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ দিলেন; সকলকে কৃষ্ণনাম-রূপ প্রসাদ (অনুগ্রহ) করিলেন; তাঁহাদের অপরাধ দূরীভূত হইলে তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইল। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

১৪৪। **তবে**—প্রভুকর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যানের পরে।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ১৪৫
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥ ১৪৬
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী ॥ ১৪৭
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরী সহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৪৮
লক্ষলক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১৪৯
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষলক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥১৫০
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫১
বাহু তুলি বোলে প্রভু—বোল হরিহরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৫২
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥ ১৫৩
রাত্রি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৫৪
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভিক্ষা করিলেন—(মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে) আহার করিলেন। বুঝা যাইতেছে, আহারের পূর্ব্বেই বেদান্ত-সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল এবং আহারের পূর্ব্বেই প্রভু কৃপা করিয়া সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ করিয়াছিলেন।

১৪৫। **বাসা ঘর**—চন্দ্রশেখরের গৃহস্থিত বাসায়।

১৪৬। **সনাতন**—সনাতন-গোস্বামী। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন সনাতন-গোস্বামীও গৌড়ের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। **শুনি দেখি**—প্রভুর মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যাদি শুনিয়া এবং তাঁহার মহিমায় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পরিবর্ত্তনাদি দেখিয়া।

১৪৭—১৫২। **সর্ব্ব বারাণসী**—বারাণসী (কাশী)-বাসী সমস্ত লোক। **বারাণসী পুরী**—কাশীনগরীতে। **দ্বারে**—প্রভুর বাসা চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে এত লোকের ভীড় হইয়াছিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। **বিশ্বেশ্বর দরশনে**—বিশ্বেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গের দর্শনার্থ (কাশীতে)।

চন্দ্রশেখরের গৃহে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ; তাই বেশী লোক সেখানে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে পারিতনা। বিশ্বেশ্বর দর্শন বা গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত প্রভু যখন বাহির হইতেন, তখন অসংখ্য লোক রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিত, তাঁহার চরণে প্রণত হইত; প্রভুও দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া "হরি হরি বোল" বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন; আর লোক সকল উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ পাতাল নিনাদিত করিয়া দিত।

১৫৩—১৫৫। **লোক নিস্তারিয়া**—হরিনাম-উপদেশাদিদ্বারা কাশীবাসী লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া। **চলিতে**—কাশী হইতে চলিয়া যাইতে। **বৃন্দাবনে** ইত্যাদি—শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে (তত্ত্বাদি শিক্ষাদানের পরে) শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। **নীলাচল**—শ্রীক্ষেত্রে। **আগে**—ভবিষ্যতে; মধ্যলীলায়।

প্রসঙ্গ পাইয়া—প্রসঙ্গক্রমে। কাশীবাসী-সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধারলীলার বর্ণন এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নহে। এই পরিচ্ছেদে সেই লীলার একটু অংশমাত্র বিবৃত হইয়াছে, বাকী অংশ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সপ্তম পরিচ্ছেদে যতটুকু বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অপ্রাসঙ্গিকভাবে করা হয় নাই; ততটুকু বর্ণনা না করিলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে পঞ্চতত্ত্ব এবং পঞ্চতত্ত্বের কার্য্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই পঞ্চতত্ত্বের একতম এবং প্রধানতম তত্ত্ব। প্রভুর সঙ্কল্প ছিল আপামর-সাধারণকে নির্ব্বিচারে প্রেমদান করা। পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া তাহা করিয়াছেন (১।৭।১৭-২৪)। প্রভু যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সজ্জন-দুর্জ্জন পঙ্গু-জড়-অন্ধজন তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। (১।৭।২৩-২৬)। কিন্তু "মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম॥

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥ ১৫৬
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৫৭
নিত্যানন্দগোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥ ১৫৮
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ ॥ ১৫৯
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সভার নিস্তার ॥ ১৬০
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য-তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৬১
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬২
সভাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার ॥ ১৬৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বা-
খ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ১।৭।২৭২৮॥" তাঁদের উদ্ধারের জন্য—তাঁহাদিগকেও প্রেমদান করার জন্যই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (১।৭।২৯—৩১)। সন্ন্যাসের পরে তাঁদের সকলেই আসিয়া প্রভুর পদানত হইয়া প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইলেন; কিন্তু কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তখনও বাকী রহিয়া গেলেন (১।৭।৩৩—৩৭)। তাঁহাদিগকেও উদ্ধার না করিলে প্রভুর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। তাই শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া প্রভু তত্রত্য মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহাতেই পঞ্চতত্ত্বের কার্য্য পূর্ণতা লাভ করিল। কিরূপে প্রভু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, তাহারই মুখ্য অংশ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—পঞ্চতত্ত্বের কার্য্যের অংশরূপে। এই অংশটী এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় পঞ্চতত্ত্বেরই কার্য্যের অঙ্গীভূত; তাই এই অংশটী বর্ণিত না হইলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনার বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; পঞ্চতত্ত্বের কার্য্যের বর্ণনার প্রসঙ্গেই সন্ন্যাসী-উদ্ধার-লীলার কিছু অংশ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

বাসুদেব-সার্ব্বভৌমও মায়াবাদী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এবং কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের স্নেহ-প্রীতি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল—যদিও প্রথমে সাধন-বিষয়ে উভয়ের লক্ষ্য ছিল পরস্পরবিরোধী। কিন্তু কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ছিলেন প্রভুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেন, অপর লোককে প্রভুর নিকট যাইতেও নিষেধ করিতেন। প্রভুর প্রতি তাঁহাদের এইরূপ তীব্র বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই সার্ব্বভৌমের ন্যায় সহজে তাঁহারা প্রভুর পদানত হয়েন নাই; তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে অনেক বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন; তাই তাঁহাদের উদ্ধারের কথা- বর্ণন-প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদের বেদান্ত-বিচারের কথাও কিছু কিছু গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৬। **এই পঞ্চতত্ত্বরূপে**—পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ইত্যাদি শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ২৬ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি এই পঞ্চতত্ত্ব।

১৫৭। **মথুরায়**—মথুরায় ও মথুরার অন্তর্গত বৃন্দাবনে।

সেনাপতি—সৈন্য-সমূহের অধিপতি। যুদ্ধের সময় সেনাপতির আদেশানুসারে সৈন্য-সমূহ যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই পয়ারে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দুই সেনাপতি বলা হইয়াছে; ভক্তিবিরোধী কার্য্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন এবং ভক্তির রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; এই সমস্ত ভক্তিগ্রন্থের সাহায্যে সর্ব্বদেশের ভক্তি-প্রচারকগণ জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া ভগবদুন্মুখ করিয়া থাকেন। এসমস্ত ভক্তি-প্রচারকগণ হইলেন সৈন্যসমূহ, শ্রীরূপ-সনাতন হইলেন তাঁহাদের সেনাপতি বা নায়ক এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি হইল সেনাপতির উপদেশ বা আদেশ।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন পশ্চিম দেশের ভক্তি-বিরোধী মতসমূহ খণ্ডন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

১৫৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন; প্রধানতঃ তিনিই বঙ্গদেশে ভক্তিপ্রচার করিয়াছেন॥ **গৌড় দেশ**—বঙ্গদেশ।

১৫৯-১৬০। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম উপদেশ দিয়া ভক্তিপ্রচার করিয়াছেন।

আপনে—মহাপ্রভু নিজে। **দক্ষিণ দেশে**—দক্ষিণ-ভারতবর্ষে। **সেতুবন্ধ**—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-সীমায় রামেশ্বর-নামক স্থান।